উৎস মানুষ

৩৩ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পরমাণু বিদ্যুৎ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
স্বাস্থ্যে বিমা	গৌতম মিস্ত্রি	৪
জাগো, গ্রাহক	মুকুল বিশ্বাস	১১
মেয়াদ-পেরনো ওষুধ	পুলক লাহিড়ী	১৪
বইমেলা ২০১৩	বরুণ ভট্টাচার্য	১৫
শর্তের জালে বিজ্ঞান গবেষণা	তুষার চক্রবর্তী	১৬
আনন্দ পাঠশালা	প্রবীর ভট্টাচার্য	১৯
আবহাওয়া চেনা	বিবেক সেন	২৩
সাপের বিষ পাচার	জামিউল আহসান সিপু	২৭
প্রকৃত শিক্ষক	দীপঙ্কর চৌধুরি	২৮
পাখি নিয়ে একদিন		২৯
জ্ঞানই যা নেই	ষড়ানন পন্ডা	৩০
চিঠিপত্র		৩১
প্রয়াত সুবীর সেন		৩২

সম্পাদক - সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

কাগুজে 'মাদার'!

মাদার টেরিজাকে নিয়ে আমাদের আহ্লাদের শেষ নেই। তাঁর সেবা-কাহিনী তো রূপকথাকে হার মানায়! নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে এই পোড়া দেশে আর্তদের কি সেবাটাই না করেছেন! গদগদ হয়ে নোবেল কমিটি তাঁকে পুরস্কারই দিয়ে বসল, তবু কেন যে তাঁর 'সেন্ট'ত্ব আটকে গেল কে জানে! এমন 'মহীয়সী'র সমালোচকেরও অভাব নেই। সম্প্রতি কানাডার একদল গবেষক যে সব কথা বলেছেন, তা শুনলে মাদার ভক্তরা কানে আঙুল দেবেন, বিড়বিড় করে বলবেন —'হে ঈশ্বর ইহারা জানে না, ইহারা কী বলিতেছে, তুমি ইহাদের ক্ষমা করিও।' ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'রিলিজিয়েন্সস' লিখছে, **'মাদার টেরিজা 'এনিথিং বাট আ সেন্ট', আ ক্রিয়েশন অভ অ্যান অর্কেস্ট্রেটেড অ্যান্ড এফেক্টিভ মিডিয়া ক্যাম্পেন হু ওয়জ জেনেরাস উইথ হার প্রেয়ার্স বাট মাইজারলি উইথ হার ফাউন্ডেশন'স মিলিয়নস হোয়েন ইট কেম টু হিউম্যানিটিস সাফারিং।'**

গবেষক সার্জ লারিভি এবং জেনেভিয়েভ চেনার্ড মাদারের অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা ছাড়াও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগ, সংগৃহিত বিপুল অর্থের সন্দেহজনক ব্যবহার এবং গর্ভপাত, জন্মনিরোধক, বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ে গোঁড়ামি নিয়ে। মারা যাওয়ার সময়েও তাঁর ৫১৭টি মিশন ছিল, যেগুলোকে বলা হয় 'হোমস ফর ডাইং'। এখানে অনেকেই আসত চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কিছুই পেত না। অসুস্থরা থাকত অস্বাস্থ্যকর জায়গায়, ঠিকঠাক চিকিৎসা পেত না, খাবারও নয়। অথচ মিশনের অর্থাভাব ছিল এমন নয়। তারা সাফল্যের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেছে! এ সব জেনে কেউ বলতেই পারেন, মাদার-ফাদার, স্বামীজি-মাতাজিদের এই দেশে সবই সম্ভব! তাই এখানে মানুষের সচেতনতার কথা না তোলাই ভাল। এই দেখুন না, ভারতে ধনীদের অন্যতম ক্রিকেটার ধোনি রাঁচিতে প্রাচীন দেওরি মন্দিরে প্রায়ই যান পুজোআচ্চার জন্য। ধনী ব্যক্তিদের, সে ব্যবসায়ী হোক বা রাজনীতিক, অভিনেতা বা খেলোয়াড় —দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি থাকতেই হয়। ধোনিরও আছে। ধোনির ঘন ঘন যাওয়ার দৌলতে তাঁর ভক্তেরাও এখন ছুটছে। দেওরিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভ্রমণ-ব্যবসা। এ দেশের উন্নতি হবে না তো কার হবে!

আরেকটা মজার ঘটনা না বললেই নয়। আগে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে রাতজেগে পড়তে হত। ঘুমে ঢুলে না পড়ার জন্য বিদ্যাসাগরের টিকিতে দড়ি বেঁধে রাখার কাহিনী সবার জানা। এখন গণ্ডা গণ্ডা প্রাইভেট টিউটর খেদিয়ে পরীক্ষা-বৈতরণী পার করিয়ে দেয়। তাতেও ভরসা না থাকলে বুদ্ধিবর্ধক দাওয়াই আছে। বিহারে এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পরীক্ষা যত এগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মী, শঙ্খপুষ্পী, মেমো প্লাস জাতীয় দাওয়াইয়ের বিক্রি বেড়েছে। এতে বুদ্ধি বাড়ে না, উল্টে ক্ষতি হতে পারে, চিকিৎসকদের এসব কথা কেউ কানে তোলে নি। পাটনার ওষুধবিক্রেতা শামশদ আলি এক মাসেই এই ধরনের ওষুধ বিক্রি করেছেন ৩০ হাজার টাকার! নবীন কুমার নামে এক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী তো স্বীকারই করেছে টিভি মারফত জানতে পেরে সে ইতিমধ্যে সাত হাজার টাকার ওষুধ খেয়ে ফেলেছে!

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

প্রচ্ছদ

পরমাণু বিদ্যুৎ : সবাই শিক্ষা নিয়েছে

আমরা বিপদ ডেকে আনছি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

গুটলি পাকিয়ে ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছে কাগজকুড়ুনি ছেলেটা। কোথা থেকে ছিঁড়ে এনেছে একটা বড় পোস্টার : ‘সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎ চাই’। ওটাকে গায়ের চাদর বানিয়েছে। পরমাণু পোস্টারের আশ্রয়ে গভীর ঘুম। চমৎকার সুখস্বপ্ন। বিদ্যুৎ কারখানা চালু হলে দেশে ঝড়খালির রাস্তার ধারে কারেন্টের আলো আসবে। বাবা কারখানায় চাকরি পাবে। মা-ও চলে আসবে কলকাতার বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে। প্রাণ ভরে খেলতে পারবে সারা দিন, কাগজ কুড়িয়ে মরতে হবে না। ... নতুন প্রজন্মের আবিল স্বপ্ন।

গভীর রাত। ঘড়িতে ১টা ২৩। সহস্র বজ্রপাতের মতো প্রকাণ্ড আওয়াজ। নতুন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ হয়েছে। ২২০ মেগাওয়াট পরমাণু চুল্লির পুরু কংক্রিট আর লোহার ঢাকনা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেছে। চুল্লির কোটর থেকে বেরোচ্ছে গনগনে আগুন, তেজস্ক্রিয় ধুলো, গ্যাস।

পর দিন সকাল। চতুর্দিকে পোড়া গাছ, ধূসর আকাশ, আর থকথকে সাদা ফেনার মতো কী যেন। বাসন্তী গোসাবা পাঠানখালি চণ্ডীপুর সজনেখালি —প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা। সাদা ফেনার মধ্যে মরা শামুকখোল টিয়া মাছরাঙা ময়না সারস। ঠোঁট বেয়ে রক্ত। দলা পাকানো কচ্ছপ শুশুক আর ব্যাঘ্রশিশু। অগুনতি মরা মাছে প্রায় ঢেকে গেছে কালিন্দী রায়মঙ্গল গোসাবা মাতলা নদী।

গত রাত্রেই মারা গেছেন চুল্লির দুজন নৈশরক্ষী। ঘটনাটা গোপন রাখতে তাঁদের দ্রুত কবর দেওয়া হয় ভোরের আগেই। কিন্তু ইউনিটের ৩০ জন তখন মৃতপ্রায়। প্রথমে তাঁদের স্পিড বোটে ক্যানিং হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসার কেউ নেই। সেখান থেকে কলকাতায়। এক জনও বাঁচেননি।

তিন চার দিনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে গেছে বিস্তর। গা-জ্বালা, বমি-ভাব, শরীর শক্তিহীন, মাথায় অদ্ভুত যন্ত্রণা, রক্তবমিও হচ্ছে। আতঙ্কে সবাই পালাতে চাইছে। হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা পালিয়েছেন কলকাতায়। অনেক পোয়াতির গর্ভপাতের খবর আসছে, কোনও সাহায্য নেই। মাছধরা ডিঙি নেই, ভুটভুটি নেই। মৃত্যুভয়ের সঙ্গে পুলিশের ভয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইউনিট সাফাইয়ের কাজে সক্ষম লোকদের জবরদস্তি ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ক্যানিং স্টেশনে থিকথিকে ভিড়। পলাতক মানুষের হুটোপাটি। বুড়ো বাচ্চা চিপ্টে যাচ্ছে। ছেলেটা হঠাৎ দেখে ট্রেনের জানলা ধরে ঝুলছেন এক বিধ্বস্ত মহিলা। চুলে জট, মাথা ঝুঁকে গেছে, মুখে বমি উঠছে। ‘মা-আ-আ ...’ চিৎকার করে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ছেলেটা। গা থেকে কখন সরে গেছে ‘সুন্দরবনে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র’র আবরণ।

—না, আসলে এ রকম কিছু ঘটেনি। এটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব কতটুকু? ২৫ এপ্রিল ১৯৮৬ মাঝরাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে উক্রাইনে চেরনোবিলে এ রকমটাই তো ঘটেছিল। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে দুর্ঘটনার বাস্তব চিত্র দুঃস্বপ্নের চেয়েও রোমহর্ষক। মৃত্যু ব্যাধি আর জন্মগত বিকৃতির মিছিল। প্রজন্ম ধরে। বহু-উচ্চারিত ‘শান্তির জন্য পরমাণু শক্তি’ যে কতখানি অশান্তি উৎপাদন করতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এই দুর্ঘটনা। ১৯৮২ সালে এই শক্তিকেন্দ্রের প্রকল্প সূচনার সময় সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, এই শক্তিকেন্দ্র এতটাই নিরাপদ ও নিখুঁত ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে একে ক্রেমলিন প্রাসাদেও নিশ্চিন্তে বসানো যায়। চার বছর পরেই এ হেন আগমার্কা ‘দুর্ঘটনা-প্রুফ’ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অকল্পনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। হাজার হাজার পুলিশ লাগিয়ে আতঙ্কিত উক্রাইনবাসীদের পালিয়ে যাওয়া ঠেকানোর চেষ্টা হয়। (দু’বছর পরে সেই পুলিশের মধ্যে চার হাজারের নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ধরা পড়ে।) তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকায় দু’সপ্তাহের মধ্যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও তখন প্রত্যেকেরই শরীরে মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তা ঢুকে গেছে। এর পর তিলে তিলে শরীরে জন্ম নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি মারণব্যাধি। রক্ত, থাইরয়েড, হাড় আর ফুসফুসের ক্যান্সার। নিঃশব্দ মৃত্যুর মিছিল। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯, উক্রাইনেই ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি।

সব দেশ এখন চেরনোবিল দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। নিচ্ছে না বোধহয় আমাদের এই বামপন্থী রাজ্য। এমনিতেই পরমাণু কেন্দ্র বসানোর অতি বিপুল খরচ, উৎপাদনে ঝক্কি, বর্জ্য নিয়ে সমাধানহীন সমস্যা ইত্যাদি তো ছিলই। তার উপর দুর্ঘটনার বিভীষিকা। ১৯৮৬-র পর রাশিয়ায় কোনও প্ল্যান্ট বসেনি। ইউরোপ আমেরিকাতে চুল্লি-প্রযুক্তির কাজ শেষ হয়েছে ১৯৯৬-এ। ডেনমার্ক অস্ট্রিয়া সরকারি ভাবে পরমাণু বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। ইরান ফিলিপিন্স তাদের চলতি পরমাণু পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে। এই যখন বিশ্বের প্রেক্ষাপট তখন পশ্চিমবঙ্গে এমন বেয়াড়া সিদ্ধান্ত কেন? সাধারণ মানুষের জানাবোঝার অধিকার তো আছে, না কি?

জিজ্ঞাসার উত্তরে বিতর্কের সুযোগ মেলে না, মেলে রাজনৈতিক বা সরকারি 'বিবৃতি'। চেরনোবিলের কথা উঠলে অনায়াসে কৈফিয়ত আসে —দুর্ঘটনা তো লাখে একটা হয়। তা নিয়ে অত দুশ্চিন্তা কেন? ...কিন্তু দুশ্চিন্তা যে হয়-ই, রীতিমতো আতঙ্ক হয়। ছোটবড় দুর্ঘটনা বা গোলযোগ যখন হরদম ঘটে, সব দেশের চুল্লিতেই ঘটে, তখন তাকে কি আর ব্যতিক্রমী বলা যায়? নাকি সেটা ওই প্রযুক্তি-ব্যবস্থার অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়!

চেরনোবিল কাণ্ডের কিছু দিন পরেই কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রচারিত বুলেটিনে (জুন ১৯৮৬) বলা হয় —১৯৭১ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে বড়সড় দুর্ঘটনা ১৪টি দেশে ১৫১ বার ঘটেছে। ১৯৭৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে ১৩৯টি যান্ত্রিক গোলযোগ থেকে বিপদ ঘটেছে। ২৮ মার্চ ১৯৭৯ আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার কাছে 'থ্রি মাইল আইল্যান্ড' পরমাণু শক্তিকেন্দ্রে দেশের বৃহত্তম দুর্ঘটনা ঘটে। দু'লক্ষ লোককে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। আমেরিকার 'সি এম ই প্রজেক্ট অব পাবলিক সিটিজেন' রিপোর্ট (১৯৮৮) জানায় দেশের বাণিজ্যিক পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে ১৯৮৬ সালে ছোট বড় বিপর্যয় ঘটেছিল ২,৮৩৬টি। ১৯৮৭-তে ২,৮১০টি।

সব দেশের দুর্ঘটনা বা গোলযোগের খবর সমান সহজে মেলে না। চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখে যে সব দেশ তার মধ্যে প্রধান হল চিন। গোপনীয়তার লিস্টিতে ভারতও রয়েছে। ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশন 'অ্যাটমিক নার্জি অ্যাক্ট ১৯৬২' সুবাদে সব রকম তথ্য গোপন রাখার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী ভিন্ন কারও কাছে কমিশন খবর প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। তবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে সংবাদকণা বেরিয়ে আসে।

ভারতে প্রথম পরমাণু শক্তিকেন্দ্র ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে বিশেষজ্ঞ ধীরেন্দ্র শর্মা জানিয়েছিলেন, দেশের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে অন্তত ৩০০টি ছোটখাটো বিঘ্ন বা বিপর্যয় ঘটেছে। তিন হাজারের বেশি ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হিসেব অজানা। ১৯৭৩ সালে চালু হয় রাজস্থানের কোটা কেন্দ্র। শুরু থেকেই যান্ত্রিক গণ্ডগোল। ১৯৮২-তে এটি সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। তার পর অনেক বার কাইগা, কলপক্কম, নরোরা বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রায়শই অপারেটরের বা যন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। বহু বার ঘটেছে। তেজস্ক্রিয়তা ছড়াচ্ছে। মানুষের অসন্তোষ জমা হচ্ছে।

এ সব অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সেই শক্তি প্রযুক্তিকেই ডেকে আনা হচ্ছে, যা এখন অধিকাংশ দেশে বর্জিত, সর্বোপরি দুর্ঘটনাপ্রবণ। ছোট্ট বিচ্যুতি বা গোলযোগ থেকেই মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা অন্য কোনও শিল্পে হয় না। প্ল্যান্টের কাজে নিখুঁত দক্ষতা আর সতর্কতা অপরিহার্য। কিন্তু রাজ্যের কর্মসংস্কৃতির বহর এখন প্রচলিত মশকরার টপিক। উপরন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসলে সেখানে কর্মী নিয়োগে কিছু দুর্নীতি হবে ধরেই নেওয়া যায়। অদক্ষ অযোগ্য কর্মী, যন্ত্রকুশলী, ইঞ্জিনিয়ারও অসাধু উপায়ে চাকরি পাবে না এ গ্যারান্টি পশ্চিমবঙ্গে কে দেবে? কোনও একজন দায়িত্বহীন অযোগ্য প্রয়োগকর্মীর সামান্য গাফিলতিতেই তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর প্রভূত সুযোগ থাকবে (বড় দুর্ঘটনার কথা বাদই দিচ্ছি)। এলাকার মানুষ আর পরিবেশ অপ্রতিরোধ্য বিকিরণে বিদ্ধ হবে। আক্রান্ত হবে অর্থনীতি। সুন্দরবনের দুর্মূল্য কাঠ মধু মোম মাছ কাঁকড়া চিংড়ির বিরাট রফতানি বাজারের সর্বনাশ হবে। এতে কার কল্যাণ?

জনগণের স্বার্থে বসানো সরকারি প্রকল্প নিয়ে নিজস্ব অভিমত জানানোর এক্তিয়ার জনগণের থাকেই। সেই মত উচ্চকণ্ঠে প্রকাশের সময় এখন। সরকার জনমতের প্রতি গুরুত্ব দেবেন তো, সততার সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে?

(লেখাটি ৪ মে ২০০০ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল)

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুণ্ডু

২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ৭০০০১২

(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

স্বাস্থ্য-বিমার মাঝে লুকিয়ে ছিলে

গৌতম মিস্ত্রি

দিন কে দিন চিকিৎসা খরচ বাড়ছে বীভৎস হারে। এদিকে সরকারি হাসপাতালে ভরসা নেই। একটা ছোটখাটো ব্যামোয় ধরলেও লাখখানেক গলে যাবে। সাবধানের মার নেই। বাবা মাসে-বছরে কয়েকটা টাকা স্বাস্থ্যবিমার খাতে জমা দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমনো যায়। ভাবখানা এমন, যেন লাগে টাকা, দেবে স্বাস্থ্যবিমা! ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। বিমার মাঝেই লুকিয়ে আছে বিমার (শরীর লক্ষ্য করে ছুটে-আসা বল)। তাই, একটু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, আর বিমা কোম্পানিকে বড়লোক না করে টাকাটা জমান, আখেরে তাতেই লাভ।

অন্য জীবের তুলনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটে গেলে মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাবে। খাদ্য, বস্ত্র ও সম্পদ সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিখতে ও পড়তে শেখা সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ভারতবাসী ইদানীং কালে স্বাস্থ্যেও বিনিয়োগ করা শুরু করেছে। জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা, আপাত সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা (মাস্টার হেল্‌থ চেক আপ) সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ। যদিও কেবল প্রথমটি ছাড়া অন্য দুটিতে ভবিষ্যতে অর্থসমাগমের আশা থাকে না। যে উপলব্ধি থেকে স্বাস্থ্যবিমা ও স্বাস্থ্যপরীক্ষায় আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সেটাকে আপাত সুস্থ অবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই কোনও তাৎক্ষণিক ফললাভের সুযোগ নেই। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় যেটাকে তাৎক্ষণিক ফল বলে মনে হতে পারে, সেটা আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ কয়েকটা সংখ্যা মাত্র। অন্তিম লক্ষ্য হল সুদূর ভবিষ্যতে হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ও কিডনির অসুখ (রেনাল ফেলিওর) নিবারণ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসা অবহেলা করলে সেই মুহূর্তে কোনও কষ্ট পেতে হয় না। আমরা জানি, অধিক ফল লাভের জন্য চাই বিনিয়োগের সঠিক সময় নির্বাচন। স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সময় ও উপায় এবারের আলোচনার বিষয়।

"I'm sorry, but stress caused by trying to figure out your health insurance is not covered by it."

ভবিষ্যতের দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর অস্তিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চেতনা, প্রেরণা ও উদ্যোগের স্তরভেদে বিভিন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসকে যদি অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে একটা সাদৃশ্য দেখা যাবে। যত আগে ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যাবে, তত কম পুঁজি লাগবে আর তত বেশি সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে। কয়েকটা উদাহরণ আলোচনা করা যাক। যদি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর, অর্থাৎ অনেক দেরি করে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হয়, তবে বিনিয়োগ বনাম খরচ আকাশছোঁয়া আর সুফল হয় অনিশ্চিত অথবা অনেক কম। আপনি যদি একটু বেশি সচেতন হন, তবে কোনও মামুলি কারণে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আপনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এমনিতে কোনও শারীরিক কষ্ট নেই। যেহেতু আপনি একটু বেশি সচেতন, অবহেলা করলেন না, চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন, উচ্চ রক্তচাপ এবং একই সঙ্গে আপনার রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা বেশি। নিয়ম করে রক্তচাপ ও রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা কমানোর ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিলেন। যদিও আপনাকে জীবনভর ওষুধ খাবার ও আনুষঙ্গিক ঝক্কি নেবার দায় নিতে হচ্ছে, তবু এটার আনুপাতিক অর্থমূল্য হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরের খরচ ও অনিশ্চয়তার থেকে অনেক কম। আবার অন্যদিকে, আপনার দশা দেখে যদি আপনার পরবর্তী প্রজন্মের এক বুদ্ধিমান উত্তরসূরী আপনার মতো মেদবহুল চেহারা না হওয়ার জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, অর্থাৎ রোজ চার থেকে ছয় কিলোমিটার করে হাঁটে, তবে তার ভবিষ্যতের দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর অস্তিত্ব নিশ্চিত করার খরচ সবথেকে কম।

এই অবধি তো বেশ বোঝা গেল। আসলে এ সবই জানা কথা। সম্পদ লগ্নি করার ক্ষেত্রে তবু ঝুঁকি থাকে। সবসময়ে ফল লাভ হয় না। স্বাস্থ্যখাতে সঠিক সময়ে খানিকটা সময়, সুদৃঢ় ইচ্ছে ও কিঞ্চিৎ পুঁজি খরচ সর্বদাই লাভজনক। এটাও বেশ কিছু লোক জানে। কিন্তু মানে না। ধূমপান করা স্বাস্থ্যহানিকর জেনেও 'আচ্ছা সে হবেখন' ভেবে ভেবেই যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে প্রবেশ করে। এ এক কঠিন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। বিদ্বজ্জনেরা এর বহুমুখী বিশ্লেষণ করেছেন।

সাধারণত খাদ্য, বস্ত্র এই গুটিকয় প্রাথমিক চাহিদা মেটার পর স্বাস্থ্যের চেয়ে জাগতিক সম্পদ নিজের আয়ত্তাধীনে আনার প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পায়। এই প্রবৃত্তিটা মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সভ্যতার বিকাশের প্রথমের দিকটায় যখন প্রাথমিক চাহিদাগুলোর নিরবচ্ছিন্ন জোগান অনিশ্চিত ছিল, তখন সঞ্চিত সম্পদ আপন অস্তিত্ব বজায়ের কাজে লাগত। এখনও সেটার প্রয়োজন ফুরায় নি। তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশের থেকে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে তার প্রয়োজন একটু বেশিই, যদিও সঞ্চিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের চেয়ে অসদ্ব্যবহারের উদাহরণই বেশি দেখা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির মাত্রাজ্ঞান নেই। শৈশবের নামতা মুখস্থ করা আর পরিণত বয়সে অসামাজিক পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির মাত্রাজ্ঞান আপন বুদ্ধিবলে আরোপ করতে হয়। মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অধরা থেকে যায় ক্রয়ের অযোগ্য জীবনের অনেক চাহিদা। আমরা হয় অজ্ঞাত থাকি অথবা ভুলে যাই সুস্বাস্থ্য ক্রয়যোগ্য সম্পদ নয়।

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকটা দশক পেরিয়ে আসার পর যেটুকু সামাজিক উন্নতি হয়েছে, তার ফল স্বরূপ আন্ত্রিক, কলেরা, গুটিবসন্ত ইত্যাদি কয়েকটি ছোঁয়াচে রোগ ও শিশুমৃত্যুর প্রকোপ কমেছে।[১]

মধ্যবিত্তর ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবহার। পাল্লা দিয়ে কমছে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন। শহুরে সংস্কৃতির কুপ্রভাবে এক উদাহরণ পাওয়া যাবে মুম্বাইতে চালানো এই সমীক্ষা থেকে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অন্য শহরের তুলনায় মুম্বাইতে গড়পড়তা আয়ু ৭ বছর কম। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলের থেকে মুম্বাই শহরে মানুষ ১২ বছর কম বাঁচে। শহরের অন্য সব সুবিধা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা, যেটা বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে আয়ু বাড়ায়, সেখানে মুম্বাইতে গড় আয়ু ৫৬.৭ বছর। বর্তমানে সারা ভারতে মানুষের গড় আয়ু ৬৩.৭ বছর।[২,৩] এখন হিসেব করে দেখা যাক, এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সুস্বাস্থ্যের বিরোধটা কোথায়?

পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্মলগ্নের আগে প্রকৃতি তখন 'কেবল সুযোগ্য সন্তানরাই টিকে থাকুক' এই মন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল। আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে এক শুভক্ষণে চতুষ্পদ মানুষের পূর্বসূরী স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষের আবির্ভাব ঘটল। জীববিবর্তনের এই সময়, যাকে প্রাকপ্রস্তর যুগ বলা হয়, মানুষকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে শিকার করতে হত, সপ্তাহে দু'চারবেলা পেটপুরে খেতে পেত। খাবার ছিল শিকারের মাংস, ফলমূল ও জংলি বেরি। একমাত্র মানুষ ছাড়া জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের অন্য সব প্রাণী তাদের পুরানো খাদ্যাভ্যাস ছাড়ে নি অথবা শারীরিক শ্রম লাঘবের উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি। এরা সব টিকে আছে, কারণ এই অভ্যাসগুলো তাদের পৃথিবীতে টিকে থাকার পক্ষে অনুকূল। বেঁচে থাকা, সুস্থ থাকা, রোগমুক্ত থাকা সহ হাজার রকমের দোষগুণ ধারণ করে প্রতিটি জীবের কোষের মধ্যে জিন। প্রকৃতির জীববিবর্তনের খেয়ালে (ইভোলিউশন) অথবা জিন বদলে গেলে (মিউটেশন) নতুন জীবের পরিবর্তিত খাদ্য ও বাঁচার পরিবেশ না পাওয়া গেলে তার অবলুপ্তি ঘটে। আবার অন্যদিকে পুরানো জিনওয়ালা জীবের ক্ষেত্রে খাদ্য ও বাঁচার পরিবেশ পাল্টে গেলে অথবা পাল্টে ফেললে তারও অস্তিত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যেমনটি ডায়নোসর সহ বেশ কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়েছে।[৪] জলের মাছ, জঙ্গলের জন্তু, আকাশের পাখি তাদের অবির্ভাবের লগ্নে যা খেত ও যা করত আজও তাই খায় ও তাই করে। বৈজ্ঞানিকরা এটাও জেনেছে, কোনও এক প্রজাতির ক্ষেত্রে জিনের মূল কাঠামো বদলায় না, বদলে গেলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে, প্রকৃতিদেবীর পরীক্ষাটা দীর্ঘ কিন্তু সাময়িকভাবে থমকে আছে। সুদীর্ঘ ১২০০০ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা সেই একই জিন বহন করে চলেছি, যদিও আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন পাল্টে

গেছে। প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে আমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছি। প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ সেই অস্তিত্বের স্থায়িত্বকাল ও গুণমান নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। আমাদের জেনেটিক পুল অর্থাৎ মূল জীববৈশিষ্ট্য যেহেতু সেই সুপ্রাচীন ১২ হাজার বছরের পুরানো, তাই খাদ্যাভ্যাস পাল্টে গেলে আর শারীরিক শ্রমের ধরণ ও পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কমে গেলে সেটা স্ব-অস্তিত্ব লোপের কারণ হবে বৈকি। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত জীবনশৈলী ১২ হাজার বছরের পুরানো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ওয়ালা আদিম মানবের জীববৈশিষ্ট্যের পক্ষে প্রতিকূল। তাই আধুনিক মানুষকে নতুন নতুন রোগের সঙ্গে এক অসম লড়াই চালাতে হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি দিয়ে আপামর জনসাধারণের রোগভোগের বোঝা কমানো যাচ্ছে না।

এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আমরা আয়ুষ্কাল বাড়াতে কিছুটা সক্ষম হয়েছি প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, হাতেগোনা কিছু রোগপ্রতিরোধক টিকার ব্যবহার ও উন্নত জীবনযাত্রার মানের জন্য আমরা মূলত আন্ত্রিক, কলেরা, গুটিবসন্ত ইত্যাদি কয়েকটি ছোঁয়াচে ও সংক্রমণযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় যে কারণটি আমাদের টিকে থাকতে সাহায্য করছে সেটা হল হাজার রকমের ওষুধ, শল্যচিকিৎসা ও বহুবিধ উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগ। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসারের দৃষ্টিভঙ্গি, অগ্রগতি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রযুক্তি মাত্রার দিক দিয়ে অত্যন্ত অল্প কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী, বাহবাযোগ্য ও অধিকতর কাম্য। দ্বিতীয় প্রযুক্তিতে আমরা আয়ুষ্কাল বাড়াতে সক্ষম হলেও সেটা এতই ব্যয়বহুল যে সেই চিকিৎসা পরিষেবা কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই সমগ্র জনগোষ্ঠীর ওপর প্রয়োগ করা অসম্ভব। এর চেয়ে বড় এক কারণেও দ্বিতীয় ধরনের প্রযুক্তির প্রসারে উল্লসিত হওয়া যাচ্ছে না। অল্প হলেও প্রথমোক্ত প্রযুক্তির সুফল স্বরূপ সংক্রমণযোগ্য রোগের হার হ্রাস পাবার জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক মানুষ এখন দীর্ঘজীবী হচ্ছে। ফলস্বরূপ, রোগ হিসাবে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, সেরিব্রাল স্ট্রোক ও কিডনির অসুখের প্রকোপ বাড়ছে। কারণ এই রোগগুলো বেশি বয়সেই আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৯-এ মুম্বাইতে চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে হৃদরোগে মৃত্যুর কারণ সবচেয়ে বেশি আর সেটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ২০০৫-এ মুম্বাইতে ১১৯২১ জন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আর ২০০৬-এ সেই সংখ্যাটা হল ১২৬০৬। চিকিৎসাবিদ্যার নবতম প্রযুক্তিতেও এই রোগসমূহ নিরাময়ের অযোগ্য। ক্রনিক রোগের তকমা এঁটে জীবনভোর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হয়। আকাশছোঁয়া সেই চিকিৎসা পরিষেবা ক্রয় করে ভুক্তভোগী আয়ুষ্কাল বাড়াতে সক্ষম হলেও গুণগত দিক দিয়ে তার কর্মক্ষমতা ও বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা মোটেই নীরোগ অবস্থার মতো থাকে না। তার সঙ্গে বহন করতে হয় বেঁচে থাকার ব্যয়বহুল খরচ। ক্ষীণ হলেও আশার কথা, এই নিরাময়ের অযোগ্য রোগগুলোও প্রতিরোধযোগ্য। কেবল অগ্রাধিকারের নিরিখে পেছনে পড়ে যাওয়া ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে না থাকার জন্য এটা ক্রমাগত অবহেলিত হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটা আয়াসসাধ্য স্বপ্নের কথা বলা যাক। এটা বহু আগেই জানা গেছে যে, প্রস্তর যুগের খাদ্যাভ্যাস ও শ্রমে অভ্যস্ত হতে পারলে আর তামাকজাতীয় বস্তুর ব্যবহার বর্জন করতে পারলে বহুলাংশে নিরাময়ের অযোগ্য বা ক্রনিক রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রস্তর যুগের মানুষের আয়ু তো আরও কম ছিল, ছিল জীবনের অনিশ্চয়তা। কিন্তু সে অনিশ্চয়তা ছিল সংক্রমণযোগ্য রোগের প্রকোপ ও খাদ্য আহরণের ঝুঁকির জন্য। সেগুলো আমরা জয় করতে পেরেছি বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে—সংক্রমণযোগ্য প্রতিরোধ করে আর খাদ্য উৎপাদনের ও সংরক্ষণের অগ্রগতি দিয়ে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আদিম মানুষের মতো ফলমূল, বেরি ও কম তেলের ব্যবহার করে, না ভাজা খাবারে অভ্যস্ত হয়ে আর নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করলে নিরাময়ের অযোগ্য বা ক্রনিক রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। এখনও কিছু কিছু আদিম অভ্যাসে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠি আছে যাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, সেরিব্রাল স্ট্রোক বড় একটা দেখা যায় না। দক্ষিণ জাপানে খাবারে দৈনিক লবনের ব্যবহার প্রায় ২৫ গ্রাম যেটা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ গুণ বেশি। এদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বেশ বেশি। আবার কেনিয়ার লুও প্রজাতির (Luo tribe) মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ খুব কম এবং দেখা গেছে তারা খাদ্যে লবণ মেশায় না। আবার শহরাঞ্চলে চলে যাওয়া লুও প্রজাতির নতুন প্রজন্মের

মধ্যে লবণের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপও বাড়তে থাকে।[৫] সমস্যা হচ্ছে আধুনিক জনজীবনে এই অভ্যাসের পুনঃপ্রয়োগের অনীহা। এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ভেবে দেখা যাক।

সমস্যাটি দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যাক। ব্যক্তিগতভাবে আপনি আপনার নিজের প্রয়োজনে ও পরিবারের স্বার্থে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভাবনা থেকে স্বাস্থ্যবিমায় বিনিয়োগ করবেন। স্বাস্থ্যবিমার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে রোগের কথা মাথায় আসবে তা হল, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ও তৎসম্পর্কিত চিকিৎসার খরচের পরিমাণ। বর্তমান কালের উপলব্ধ নবতম আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির পরিষেবা পেতে হলে বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে হৃদরোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার খরচ ২-৩ লাখের কম হবে না। এই রোগের কথা মাথায় রেখে আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার হলে বাৎসরিক স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম প্রায় ২৫ হাজার। এই হিসেবটা আপনার বয়স ৪০-এর কম হলে। আপনি ৬০ বছর বাঁচতে চাইলে বিমাসংস্থাকে আপনি ২০ বছরে দিলেন প্রায় ৫ লাখ টাকা। এই বিনিয়োগে আপনি পেলেন কেবল আপনার ও আপনার পরিবারের হাসপাতালে ভর্তির যোগ্য রোগের চিকিৎসার খরচের আংশিক আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। প্রিমিয়ামের এই অর্থ ২০ বছর ধরে ৭ শতাংশ হারে ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট করলে আপনি পেতে পারেন কমপক্ষে ১২ লাখ টাকা।

সারণি ১: ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়ামের অঙ্কের সমমানের ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট (৭%)

বৎসর	বিনিয়োগ (টাকা)	সুদে আসলে (টাকা)
১	২৫০০০	২৬৭৫০
২	২৫০০০	৫৫৩৭৩
১৯	২৫০০০	১০৯৬৬২৯
২০	২৫০০০	১২০০১৪৩
মোট বিনিয়োগ ৫০০০০০		**মেয়াদ শেষে প্রাপ্য** ১২০০১৪৩

এই অর্থে আপনাদের সব সদস্যের হার্ট অ্যাটাক মেরামত করা যায়। এটা যদিও একটা সরলীকরণ, কিন্তু এই অঙ্কেই বিমাসংস্থা ব্যবসা করে ও বেশ লাভও করে। আরও একটা দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ। হার্ট অ্যাটাকের পরে বেঁচে গেলেও আপনার পরবর্তী জীবনে নিশ্চিতরূপে কর্মক্ষমতা কমে যাবার জন্য একদিকে যেমন আপনার বেঁচে থাকার খরচ বেড়ে যায় (বিমাসংস্থা আপনার সারা জীবনের চিকিৎসার ভার নেয় না) অন্যদিকে আপনার আয় করার ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায়।

সমস্যাটির একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজের অধিক অংশের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রের বহন করার কথা, তাই তার স্বাস্থ্য বরাদ্দের সিংহভাগই খরচ হয়ে যায় তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবোধে গুটিকয় অসুস্থ রোগীকে কোনও রকম ভাবে টিকিয়ে রাখার কাজে। অধিক ফলদায়ী রোগ প্রতিরোধ নিবারণ কর্মসূচি অবহেলিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, দৃষ্টিভঙ্গিতে গলদ কোথায়? সমস্যা দ্বিবিধ। ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজনীয় শিক্ষা, চেতনা ও অনুপ্রেরণার অভাব আর অপরদিকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সদিচ্ছা ও সুদূরপ্রসারী ফল লাভের দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে।

১) ব্যক্তিগত উদ্যোগ :

এই অভাব আবার দেশ, কাল ও স্থানীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন। আমাদের দেশের কোনও পরিসংখ্যান নেই। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, সেরিব্রাল স্ট্রোক ও কিডনির অসুখের মতো নিরাময়ের অযোগ্য ক্রনিক রোগসমূহ বহুলাংশে প্রতিরোধযোগ্য। এই ধরনের স্বাস্থ্যশিক্ষার কোনও চালু প্রকল্প নেই। হয় উপভোক্তাকে অন্য কোনও কারণে চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারস্থ হতে হয় ও একই সঙ্গে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার সাথে সাথে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বা চিকিৎসককে অতি সক্রিয় হয়ে সেই মুহূর্তে আপাত অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানাতে হয়। কোনওভাবে রোগ প্রতিরোধের সেই পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত প্রযুক্তি ব্যক্তিগতভাবে জানানো গেলেও দ্বিতীয় বাধা অগ্রাধিকারের। আসলে এই প্রযুক্তির সফলতা তাদের নিজের জীবনে উপলব্ধি হয় নি বা তার নিকটতম কোনও ব্যক্তি বর্তমান বা অতীতে দৃষ্টান্তমূলকভাবে উপলব্ধি করে নি। নিম্নবিত্তর কথা ছেড়ে দিলেও, মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের কাছে শুধুমাত্র তাদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করলে রোগপ্রতিরোধের কর্মসূচি সঙ্গত কারণেই অগ্রাধিকারের সারনিতে পিছিয়ে পড়বে। অনেকেই হয়তো বিশ্বাসযোগ্যভাবেই জানেন দৈনিক এক ঘণ্টা করে হাঁটলে রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগের তীব্রতা অনেকটাই কমানো যায়, কিন্তু অর্থ উপার্জনের সময় থেকে ঐ এক ঘণ্টা সময় কমিয়ে নেবার ঝুঁকি নেওয়া ও উদ্যোগ নেবার স্থবিরতা কাটাতে পারেন না। উন্নত দেশের নাগরিকদের মতো সামাজিক সুরক্ষা আমাদের নেই। সময়ের এহেন অপচয়ের (?) আগে আমাদের অনেক হিসেবনিকেশ করতে হয়। তাই শুধুমাত্র পশ্চিমী দুনিয়ায় সফলকাম স্বাস্থ্যশিক্ষা আমাদের দেশে অসফল। আমাদের উপযোগী করার জন্য পশ্চিমী দুনিয়ায় কার্যকরী স্বাস্থ্যশিক্ষার সাথে অর্থনীতিকেও জুড়তে হবে। হিসাব করে দেখাতে হবে যে, দৈনিক এক ঘণ্টা করে কম অর্থ উপার্জন করলে যে আর্থিক ক্ষতি, সেটা সুদে আসলে পূরণ হওয়া সম্ভব। কারণ তাতে যে সুনিশ্চিত ও কর্মক্ষম জীবৎকাল লাভ সম্ভব তাতে কম করেও আরও দশটা বছর বেশি সময় ধরে অর্থ উপার্জন করা

যাবে। সুদ হিসাবে লাভ হবে অনেক কম খরচের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বৃদ্ধ বয়সের শেষের ক'টা দিন।

২) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ :

হাতে গোনা যে কয়েকটি রোগ প্রতিরোধের কর্মসূচি সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর বেশ কয়েকটির উন্নত দেশসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মসূচির অঙ্গ।[৬] কারণ সেগুলো মূলত সংক্রমণযোগ্য। এই কর্মসূচিতে তাদেরও স্বার্থ জড়িত। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সেই ধরনের রোগ নির্মূল করতে না পারলে তারা আতঙ্কিত হয়। বিশ্বায়নের ফলে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ও পোলিও রোগ দেশের সীমারেখা মানবে না। অথচ আমাদের দেশে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ আর সেরিব্রাল স্ট্রোকের বাড়বাড়ন্তে তাদের ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে ষোলআনা। আধুনিক চিকিৎসার ওষুধপত্র ও আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির ব্যবসা তো ওদের কুক্ষিগত। প্রথমে নিজের দেশে সমালোচনায় জর্জরিত ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি আর কোকাকোলার আফিঙ নিয়ে ভারতের স্বাস্থ্যকর চিঁড়ে-মুড়ির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ডায়াবেটিস আর হৃদরোগের প্রকোপে ইন্ধন যোগাবে আর তার পরে উল্লাস গোপন করে কুমিরের কান্না কাঁদবে। মোটা পয়সার বিনিময়ে দেশে বিদেশে পাঁচতারা হোটেলে লেকচার দেবে আর ওষুধের পসরা সাজিয়ে লুটেপুটে খাবে। এ এক অন্য ধরনের অর্থনৈতিক পরাধীনতা বটে। আমাদের স্বার্থ আমাদেরই দেখতে হবে। কিন্তু দেখবে কে? সংক্রমণযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে যদিও ব্যক্তিগত উদ্যোগ অর্থহীন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ আর সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো ক্রনিক নিরাময়ের অযোগ্য কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য রোগের ক্ষেত্রে একক উদ্যোগও সমানভাবে কার্যকরী। প্রয়োজন উপভোক্তাকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্তির সুলুক সন্ধান পৌঁছে দেওয়া, সেই প্রযুক্তিতে বিশ্বাস জন্মানো, প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় রসদ ও অনুপ্রেরণা যোগানো, আর সর্বোপরি উপভোক্তাকে প্রয়োগ করা প্রযুক্তির সফলতার স্বাদ উপভোগ করানো। রাষ্ট্র অথবা অন্য সমাজসেবামূলক সংস্থার কাছে রোগপ্রতিরোধের প্রযুক্তির এই জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করার মতো মননের যথেষ্ট অভাব আছে। আরও অভাব আছে ফল লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করার ধৈর্য। তুলনামূলক ভাবে চক্ষু অপারেশন শিবির স্বল্প আয়াসসাধ্য আর তাৎক্ষণিক ফললাভের জনপ্রিয়তা অর্জনে অধিক সক্ষম অথবা হেপাটাইটিসের টিকাদানের কর্মসূচি স্বল্প আয়াসসাধ্য আর সমাজসেবামূলক মনোভাবের আড়ালে অর্থ উপার্জনের আর এক উপায়।

কিছুটা হলেও বোঝা গেল, আতঙ্কিত হবার মতো ক্রমবর্ধমান লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও বিভিন্ন কারণে উল্লিখিত ক্রনিক নিরাময়ের অযোগ্য রোগপ্রতিরোধের কোনও সুপরিকল্পিত কর্মসূচি চালু নেই।

যদিও রোগ প্রতিরোধের পথ ছাড়া সামগ্রিক কোনও জনগোষ্ঠির পক্ষে নীরোগ কর্মক্ষম ও সহজলভ্য জীবন উপভোগ অসম্ভব, একক ভাবে এই প্রতিবেদক এর সফল প্রয়োগবিধির রূপরেখা রচনা করতে অক্ষম। প্রয়োজন মনস্তত্ত্ববিদের, যে নির্ণয় করবে আর সমাধানসূত্র দেবে কী কারণে জানা সত্ত্বেও একজন চিকিৎসক ধূমপান বন্ধ করতে পারে না, কী কারণে হাঁটুতে বাত না থাকলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্মেলনে লিফট থাকলে সিঁড়ির ব্যবহার কম হয়, কী কারণে স্থূলতায় ভোগা সচেতন ব্যক্তি প্রাতঃভ্রমণে বের হয় না, কী কারণে কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে জনপ্রিয় না হবার দোষে বাজার থেকে সাধারণ মানুষের আয়ত্বাধীন সরকারি ডেয়ারির চর্বিহীন দুধ উধাও (ডবল টোনড দুধ চর্বিহীন নয়) হয়ে যায়। আরও প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের যার সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া চিকিৎসক, মনস্তত্ত্ববিদ ও সমমনোভাবাপন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থার সম্মিলিত রূপরেখার প্রয়োগ অসম্ভব।

প্রিয় পাঠক, এই অবধি পড়েও যদি আপনার ধৈর্য থাকে আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের ইচ্ছা বজায় থাকে তবে নীচের পরিচ্ছেদটিতে মনোনিবেশ করতে পারেন। আপনার বয়স ও ইতিমধ্যে অর্জিত রোগের মাত্রা অনুযায়ী (যদি থেকে থাকে) বিনিয়োগ বেছে নিন।

১) বয়স ২ থেকে ১০ : এই বয়সে শিশুর পছন্দের অভ্যাসগুলো তৈরি হয় বলে ক্রনিক রোগসমূহ নিবারণের সবথেকে কার্যকরী নিশানা এরা। খাদ্যে লবণ ও চিনির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিত। খেতে না চাইলে ধৈর্য ধরে ঐ একই খাবার দিতে হবে। শিশুর খাদ্যে লবণ ও চিনি আবশ্যক নয়। শিশুর খাবারের শর্করা জাতীয় খাবার গ্লুকোজ যোগাবে। আয়োডিন মেশানো লবন দিয়ে যে ডাল ও সবজি রান্না হবে সেটা যথেষ্ট। আলাদা করে খাবার সময় লবণ মেশানোর কোনও জৈবিক প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, প্রাকৃতিক না রান্না করা খাবারে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট লবণ থাকে। অভিভাবকদের সুবিধা হবে বলে, টেলিভিশন ও কমপিউটারের সামনে বসিয়ে রাখা চলবে না। এই সব অভ্যাসে শিশু একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে সে বড় হয়ে খাবারে অতিরিক্ত লবণ ও চিনি খেতে চাইবে না। টেলিভিশনের সামনে বসে না থেকে দৌড়ে বেড়ানোর খেলা খেলতে অভ্যস্ত হবে। আপনার দু'চার বছরের খাটনির ফলে শিশুর ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

২) বয়স ১১-২০ : কঠিন হলেও উপরে উল্লিখিত অভ্যাসে অভ্যস্ত করাতে হবে, তবে যেহেতু এই বয়সের শিশুরা স্পর্শকাতর হয়, বেশি ধৈর্য দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে, শিশুর উপযোগী যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। শিশুর ওজনের দিকে খেয়াল রাখুন। যে কোনও মূল্যে স্থূলতা রোধ করতে হবে।

৩) ২০-৩০ : খাদ্যের দিকে নজর রাখুন। পরিমাণের দিক

দিয়ে, খাদ্যে সবজির অংশ অর্ধেক হবে। রান্নাঘরে বিপ্লব ঘটাতে হবে। সনাতন বাঙালি রান্নার পদ্ধতি ছেড়ে মাথায় রাখতে হবে কোনও রান্নার পদ্ধতিতে গরম কড়াইতে তেল ঢেলে ফোড়ন অথবা কিছু ভাজা চলবে না। আঁতকে উঠবেন না। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ভেজে খাওয়ার রীতি নেই। আমাদের একটা প্রজন্ম রান্নার রীতি কষ্ট করে পাল্টে ফেলতে পারলে উত্তরসূরীদের একটা সুস্বাস্থ্যময় জীবন উপহার দিয়ে যেতে পারব। খাবারের টেবিলে ফল রাখুন পর্যাপ্ত পরিমাণে। হঠাৎ খিদে পেলে কেক বিস্কুট না দিয়ে ফল, জলে ভেজানো অঙ্কুরিত ছোলা, চিঁড়ে মুড়ি ছাতু ইত্যাদি দিন। কেবল বই মুখে করে যেন বসে না থাকে। মস্তিষ্ককে বহন ও ধারণ করার উপযোগী শরীরও প্রয়োজন। সমবয়সীদের সাথে বাড়ির বাইরের খেলা খেলতে উৎসাহ দিন। উপায় না থাকলে ঘরে ঘণ্টাখানেক স্কিপিং বা হাঁপিয়ে যায় আর ঘেমে যায় এমন খেলা বা ব্যায়াম করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৪) বয়স ৩০-এর বেশি এবং আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ: এই বয়সে নতুন করে অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। উপরের অংশে বিবৃত খাবারে অভ্যস্ত হতে হবে। দৈনিক ১ ঘণ্টায় ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটুন। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ হলেও প্রতি দু'বছর অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পণ্য হিসাবে মাস্টার হেলথ চেকআপ নয়, গুটিকয় তথ্য জানলেই যথেষ্ট।

বাঞ্ছনীয়

১. আপনার রক্তচাপ ১৪০/৮০ থেকে কম।
২. দেহভর (বি এম আই) ২৩-এর নিচে (কিলোগ্রামে শরীরের ওজনকে মিটারে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে দেহভর নির্ণয় করা যাবে)
১২ ঘণ্টা উপোস করে (যেমন ধরুন রাত ন'টা থেকে সকাল ন'টা)
এই রক্ত পরীক্ষাগুলো করুন।
৩. রক্তে সুগারের মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম
৪. মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা ২০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম
৫. এল ডি এল কোলেস্টেরলের মাত্রা ১৩০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম
৬. এইচ ডি এল কোলেস্টেরলের মাত্রা ৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের বেশি
৭. ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা ১৫০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের কম

এগুলোর একটাও অস্বাভাবিক হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৫) নিরাময়ের অযোগ্য রোগে রোগাক্রান্ত : অত্যাধুনিক ওষুধ ও অন্যান্য প্রযুক্তি আপনাকে টিকিয়ে রাখবে। ভালো রাখবে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী এবং সেটা তুলনামূলকভাবে কম খরচে। উপরের নির্দেশিকা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কেবল হাঁটা বা অন্যান্য ব্যায়াম করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

৬) আপনি যদি শিক্ষাবিদ হন : ক্রয়ের অযোগ্য স্বাস্থ্যর জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যথাযথ শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর জন্য আপনার সাধ্যমতো চেষ্টা করুন।

বিগত ৫০ বছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ও ভি আই পি-দের যাতায়াত আছে এমন সব জায়গায় অটোমেটেড এক্সটারনাল ডিফিব্রিলেটার (Automated external defibrillator, AED) নামে যে বস্তুটি হয়তো আপনার চোখে পড়েছে সেটা হঠাৎ হৃদযন্ত্র থেমে গেলে অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে কখনও কখনও ফিরিয়ে আনতে পারে। করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি হার্ট অ্যাটাকের পরে সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ৫০ শতাংশ মৃত্যু ঠেকাতে পারে। অটোমেটেড ইমপ্লান্টেবেল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটার নামে এক ধরনের পেসমেকার (Automated implantable cardioverter defibrillator, AICD) হৃদয়ের বিশেষ ধরনের ছন্দপতনের মারণ রোগে (Life threatening arrhythmia) মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ কমাতে সক্ষম।[৭]

এই পরিসংখ্যান সমূহ ও বর্তমানে প্রাধান্য পাওয়া রোগ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা দেখে মনে হতে পারে, যদি কোনও রাষ্ট্র উপরোক্ত উন্নত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা সমগ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দ করতে পারে, তবে ধূমপান বর্জনের প্রচার, খেলাধুলার জন্য পার্ক ও মাঠ, স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সরবরাহ ও ব্যবহারে উৎসাহদান, এমনকি জীবনভর উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ওষুধের ব্যবহার তেমনটি অর্থবহ থাকে না। বাস্তব তথ্য অনুসন্ধানে বোঝা গেছে, ধনী দরিদ্র, সব রাষ্ট্র ও সকল জনগোষ্ঠীর জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলই একমাত্র সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথ।[৮]

একটা অঙ্ক করা যাক। সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩০ থেকে ৮৪ বছরের মানুষের মধ্যে:

১. মৃত্যুহার লাখে ১০০৭

২. যারা নিয়ম করে ব্যায়াম নয়, জীবনযাত্রায় কেবলমাত্র

শারীরিক শ্রম করে, তাদের মৃত্যু হার ৩০ শতাংশ কম

৩. ৭০% সক্ষম ব্যক্তি শারীরিক শ্রম করে না

৪. এক লাখে ৯০০২৪ জন আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ

যদি সব আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ ব্যক্তি জীবনযাত্রায় কেবলমাত্র শারীরিক শ্রমের অন্তর্ভুক্তি করে তবে লাখে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায়=৯০০২৮×(৭০/১০০)×(৩০/১০০)×(১০০৭/১০০০০০) = ১৯০

এই সংখ্যাটা এবার তুলনা করুন কয়েকটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে

প্রযুক্তি	প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সংখ্যা(লাখে)
সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় অটোমেটেড এক্সটারনাল ডিফিব্রিলেটার	১.৯
সমস্ত হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে করোনারি অ্যানজিওপ্লাস্টি	১৫.১
সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অটোমেটেড ইমপ্লান্টেবেল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটার	৬৩
প্রত্যেকের দৈনিক খাদ্যে প্রয়োজনীয় সবজি ও ফলের অন্তর্ভুক্তি	১৫৮
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তামাকে (সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক) সংস্রব বর্জন	১৫৯
সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিটের শারীরিক ব্যায়াম (অ্যারোবিক)	৩৩৪

আমেরিকার মতো দেশে ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট কেবলমাত্র ৮% মৃত্যুহার রদ করতে পারে যদিও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য, নিয়মমত শারীরিক ব্যায়াম আর তামাক বর্জন সামগ্রিকভাবে ৪৯% মৃত্যুহার কমাতে সক্ষম।[৭] এটা অনস্বীকার্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকতর উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি মরণাপন্ন রোগীকে জীবনদান করে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য অর্জনের কেবল একটাই পথ। সেই অনুকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল অর্জনের দিকেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ ও উদ্যোগ বিনিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাকে আমার এক সহকর্মী চিকিৎসক প্রশ্ন করেছিল 'তুই এসব লেখালেখি করছিস কেন? এতে কাজের কাজ কী কিছু হবে?' প্রশ্নটা আমার মতো অনেক চিকিৎসকেরই মাথায় আসে। আমি একটা উত্তরই জানি। কিছুটা হলেও সাঁতারের কৌশলটা আমি জানি। যে চিন্তাধারা থেকে জলে ডোবা আধমরা মানুষগুলোকে বাঁচানোর থেকে আমার চারপাশের সাঁতার না জানা মানুষদের আমি সাঁতার শেখাতে চাই, ঠিক সেই ভাবনার বহিঃপ্রকাশের অন্য উপায় আমার জানা নেই।

সূত্র :

1. JAMA, January 6, 1999, No. 1>Trends in Infectious Disease Mortality in the United States During the 20th Century.

2. Human Development Report 2009 prepared by the National Resource Centre for Urban Poverty and the All India Institute of Local Self Government, Mumbai.

3. http://toostep.com/insight/why-there-is-short-life-span-among-indians.

4. Lloyd, G.T., Davis, K.E. Pisani, D. (22 July 2008), "Dinosaurs and the Cretaceous Terrestrial Revolution". *Proceedings of the Royal Society:Biology* 275 (1650): 2483-90. doi:10, 1098/rspb.2008.0715. PMC 2603200. PMID 18647715. Retrieved 2008-07-28.

5. *Circulation.* 1990; 81: 987-995.

6. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, 2006.

7. Kottke TE, Faith DA, Jordan CO, Pronk NP, Thomas RJ, Capewell S. The comparative effectiveness of heart disease prevention and treatment strategies. *Am J Prev Med.* Jan 2009 ;36(1): 82-88 e85

8. Mobilizing Action Toward Community Health (MATCH): Population Health Metrics, Solid Partnerships, and Real Incentives 2012.

উ মা

বেচারা ডলফিন

জাপানের তাইজি উপকূলে নির্বিচারে মারা হচ্ছে বট্‌ল নোজ ডলফিনদের। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল চলে এই নিধনযজ্ঞ। খেলা দেখানোর জন্য যত ডলফিন ধরা হয়, তার অন্তত চারগুণ ডলফিন মারা হয় খাওয়ার জন্য। জাপানে এক কেজি ডলফিনের মাংসের দাম ১০ পাউন্ড। ডলফিন নিরীহ প্রাণী। ফলে ওদের নিয়ে ঝামেলা কম। প্রথমে সাঁতারুরা জলে নেমে ওদের টিপেটাপে দেখে ওদের দিয়ে খেলা দেখানোর কাজ চলবে কি না। চললে পাচার হয় বিভিন্ন ডলফিন পার্ক বা ওয়াটার পার্কে। আর যদি না চলে তাহলে তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয় না। সেখানেই মেরে ফেলা হয় মাংসের জন্য। এই সময়ে তাইজি উপসাগরের খাঁড়িটার রঙ লাল থাকে। না, সেটা রক্তরঙা শৈবালের কারণে নয়, ডলফিনের রক্তে। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এমনিতেই সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট ট্যাঙ্কে রাখার জন্য ডলফিনরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে ডলফিনদের আয়ু ৬০-৭০ বছর। কিন্তু এই অবস্থায় থাকার জন্য অবসাদে ভুগে ওরা সাত-আট বছরেই মারা যায়। এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ৭৩ বছর বয়সী রিক ও'ব্যারি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ডলফিনরা নিরীহ প্রাণী, ওদের প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই, ওদের জন্য মোমবাতি নিয়ে মিছিল করারও কেউ নেই। অগত্যা, চলুক হত্যালীলা!

জাগো, গ্রাহক জাগো

মুকুল বিশ্বাস

'জাগো, গ্রাহক জাগো' ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের এই স্লোগানে যদি ক্রেতারা সত্যিই জেগে ওঠেন ও তৎপর হন নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে তবে সত্যিই খুব অসুবিধায় পড়বে এই দপ্তরের অধীন, অন্যতম প্রাচীনতম নজরদারি বিভাগ, যার বর্তমান পোশাকি নাম 'বৈধ পরিমাপ অধিকরণ' (Directorate of Legal Metrology)।

ওজনে কম দেওয়ার রেওয়াজ দেশি-বিদেশে খুবই পুরোনো। ইংল্যান্ডে এক সময় অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা স্যাময় চামড়ার ব্যাগে ঝাঁকিয়ে স্বর্ণমুদ্রার কুচি ছুরি দিয়ে চেঁছে বার করে নেওয়া হত —একে বলা হত sweating —এ ঘাম স্বর্ণমুদ্রারও বটে এবং যে ঝাঁকিয়েছে সেই ব্যক্তিরও।

আমাদের দেশে ওজনে কম দেওয়া বন্ধ করার চেষ্টাও খুব প্রাচীন। মনুসংহিতায় ওজন ও তুলাযন্ত্র প্রতি ৬ মাস অন্তর পরীক্ষা করার কথা আছে —

তুলামানং প্রতিমানং সর্ব্বস্যাৎ সুলক্ষিতম
ষটষু ষটষু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ।।

চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তুলাযন্ত্রের মাপজোক নির্দিষ্ট (স্ট্যান্ডার্ডাইজ) করার কথা আছে। সম্রাট আলাউদ্দিনের আমলে ওজনে কম দেওয়া বন্ধ করার চেষ্টায় হাত কেটে নেওয়ার বিধান ছিল। ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধিতে পুলিশের হাতে ২৬৪-২৬৭ ধারায় এ সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ১৯৫৬ সালে দেশে ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ পৃথক আইন ও নতুন দপ্তর তৈরি হয়, আসে মেট্রিক পদ্ধতি। পরে ১৯৭৬ ও ১৯৯০-এর পর সর্বশেষে ঐ আইন ঘষে-মেজে ২০০৯-এর লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট ২০০৯ ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুলস ২০১১, লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড্ কমোডিটিস) রুলস ২০১১, লিগ্যাল মেট্রোলজি (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০১১ ইত্যাদি তৈরি হয়। ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়টি যুগ্ম তালিকায় আছে তাই কেন্দ্রের করা আইন সব রাজ্য বিশেষ কিছু নিয়ম জুড়ে নিজ নিজ রাজ্যে জারি করে প্রয়োগ করে।

লিগ্যাল মেট্রোলজি (জেনারেল) রুলস্ ২০১১-তেই ১১, ১২ ও ১৩ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ব্যবসায় (ট্রানজ্যাকশন) ও সুরক্ষায় (প্রোটেকশন) ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপ এবং তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদির গঠন, বৈশিষ্ট্য, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বা ৮ম তফসিলে অনুরূপ ওজন ও পরিমাপ এবং তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদির গঠন, বৈশিষ্টের সঙ্গে হবহু মিলতে হবে (...shall conform as regards physical characteristics, configuration, constructional details, materials, performances, tolerances and such details to the corresponding specifications laid down for...)। তা মিলছে কি না তার পরীক্ষণ পদ্ধতিরও বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। একই কথা আছে রাজ্যের ২০১১-র বলবৎকরণ (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মের ৮ নম্বর ধারাতেও।

বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে নতুন নতুন যন্ত্রাদি তৈরি হচ্ছে এবং বাজারেও আসছে কিন্তু তা ক্রেতাদের ন্যায্য পরিমাণ পাওয়ার ব্যাপারে সহায়ক কি না বা সহায়ক করতে গেলে কী কী করতে হবে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। যাঁরা এই ব্যাপারটি দেখবেন ও বুঝবেন তাদের সংখ্যার অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার অভাবই এর প্রধান অন্তরায়।

এই অবস্থায় ক্রেতারা যাতে জেগে উঠে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য জেনে সুরক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্য) সেটাই ইচ্ছে এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর তার জন্যেই সচেষ্ট। এই রচনাটির উদ্দেশ্যও তাই।

বোঝাই যাচ্ছে, বহু ধরনের যন্ত্রাদির প্রসঙ্গ আসবে। বর্তমান সংখ্যায় সবচেয়ে প্রাচীন তুলাদণ্ড সোজা বাংলায় যাকে বলে কাঁটা বা দাঁড়ি-পাল্লা (equi-arm balances), বাটখাড়া ও কেরোসিন ইত্যাদি মাপার পরিমাপ পাত্র (capacity measures) নিয়ে আলোচনা সীমিত রাখব। বাজার ছেয়ে যাওয়া ইলেকট্রনিক (ডিজিট্যাল) ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র, পেট্রোল / ডিজেল মাপা যন্ত্র (fuel dispensers) বা জটিলতর যন্ত্রাদি যাতে ঠকার /ঠকানোর সম্ভাবনাই বেশি সেগুলি ঠেকানোর ব্যবস্থা নিয়ে পরের কোনো সংখ্যায় আলোচনার ইচ্ছে রইল।

প্রথমেই আসি হাটে/বাজারে, সাধারণ মুদিখানায় দেখা, এখনও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কাঁটা বা দাঁড়িপাল্লায়। মাছের দোকানে ইনিই ১ কি গ্রা কে ৯০০ গ্রা বানান বলে অভিযোগ। ওজনে কমের কথা উঠলেই মাছের দোকানের নাম আগে আসে তারপর ফল—আম, লিচু, আপেল ইত্যাদির কথা। মনে রাখতে হবে কাঠের লাঠির দু'প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝোলানো দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার বর্তমানে দণ্ডনীয় অপরাধ (যদিও সবজির পাইকারি বাজারে এর এখনও রমরমা। এমনকি খোদ কলকাতার কোলে

মার্কেটেও)। ধাতুর তৈরি সূচক যুক্ত কাঁটা বা দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার আইনি। এটি হাতে না ধরে ঝুলিয়ে ব্যবহার করাই বিধি।

এটি ঠিক মাঝখানে আলম্ব থাকা তিন ছুরি (knives) বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর লিভার। A প্রান্তে বাঁ দিকে ঝোলানো পাল্লায় বাটখাড়া ও B প্রান্তে ঝোলানো পাল্লায় থাকে পণ্য, F আলম্ব (Fulcrum)।

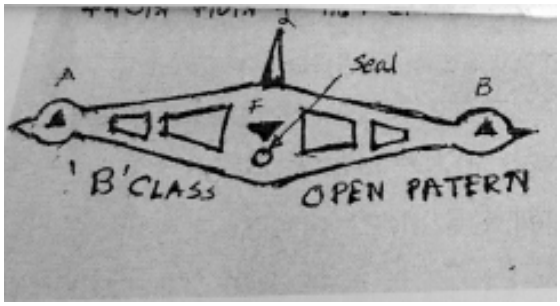

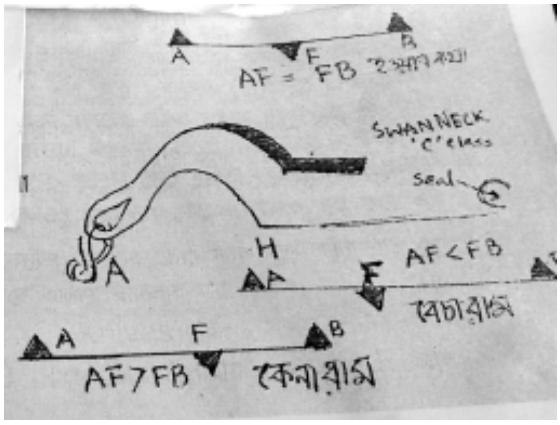

AF = FB থাকার কথা। মাছের বা মুদির দোকানের কাঁটার গলা হাঁসের মতো বাঁকানো বলে swan neck এবং এগুলির সূক্ষ্মতা/সুবেদিতা (sensitiveness) কম (এই রকম একটি বৈধ ও ব্যবহার হচ্ছে এমন ৫ কি গ্রা ক্ষমতার কাঁটার দু'পাশে ৫ কি গ্রা দিয়ে সমান করার পর ৯ গ্রা না দিলে সূচক নাও নড়তে পারে এবং ১২ গ্রা পর্যন্ত ত্রুটি এর ছাড়) বলে এদের C class-এ এবং সোনার দোকানের কাঁটার সূক্ষ্মতা বেশি (একই রকম ৫ কি গ্রা ক্ষমতার কাঁটার জন্য যথাক্রমে ৯০০ মিলি গ্রা এবং ১২০০ মিলি গ্রা) এদের class B এবং এরা open pattern / flat type ফাঁকযুক্ত বা চ্যাপ্টা পাতের মতো হয়।

এই কাঁটার A মাথা ঠুকে H-এর (ভিতর) দিকে নিলে বাহুদৈর্ঘ্য কমান যায় এবং বিপরীত (বাইরের) দিকে ঠুকে বাড়ানো যায়। ফল ওজনে তারতম্য ঘটা। এইভাবে ঠুকে বাটখাড়ার বাহু ছোট ও পণ্যর দিকে বাহু বাড়িয়ে দিয়ে AF< FB করে 'বেচারাম' কাঁটা, বিপরীত ভাবে ঠুকে 'কেনারাম' কাঁটা বানানো হয়। পুরোনো

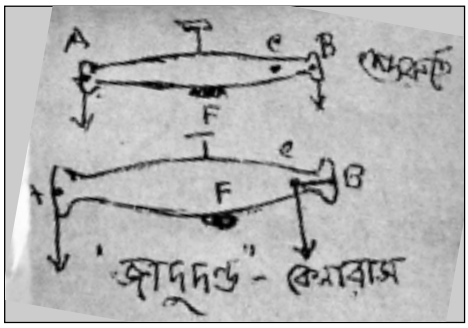

খবরের কাগজের ক্রেতার 'কেনারাম' হাতপাল্লাটি একটি 'জাদুদণ্ড'। ছোট বে-আইনি কাঠের হাতপাল্লায় ৩টি ফুটো থাকে —দুপাশে দুটি A ও B যা থেকে প্রথমে পাল্লা দুটি ঝোলে ও সমান দেখায়। মধ্যের গিঁটটি বড় এবং ঘোরানো যায়। কাগজ ওজনের সময় ডানদিকের পাল্লায় গিঁট সরিয়ে C-তে এবং মধ্যের গিঁটটি ডান দিকে ঠেলে আনা হয় —ফলে পণ্যর বাহু ছোট হয় এবং প্রায় ১২৫০ গ্রা কাগজ দিলে দণ্ড অনুভূমিক হয়ে ১ কি গ্রা দেখায়। পরে ঐ ১ কি গ্রা বাটখাড়া ও ১২৫০ গ্রা কাগজ (এরা ঐ একটি মাত্র বাটখাড়াই আনে) এই ২২৫০ গ্রা -কে ২ কি গ্রা বলে বাঁদিকে চাপিয়ে প্রায় ৩ কি গ্রা কাগজকে ডান দিকে চাপিয়ে সমান করে এবং ২ কি গ্রা হিসাবে তারা ঐ ৩ কি গ্রা কাগজ (হাত বা পায়ের কারসাজি ছাড়াই) কেনে। হাত বা পায়ের (ধরা, চাপা বা ঠেলার) কারসাজি দেখাতে পারলে (এরা সর্বদা বসে ওজন করে) চুরি আরও হতে পারে।

মাছের দোকানে ওজনে কম পাওয়ার অভিযোগ সর্বাধিক। দামি ফলের বা আম, লিচুর দোকানে / ফুটপাতে ওজনে কম পাওয়া (কিলোতে ৮৫০ গ্রা - ৯০০ গ্রা) রোজকার অভিযোগ এবং প্রায় সর্বদা সত্য। কাঁটাটি ঠুকে 'বেচারাম' বানিয়ে ৬০/৭০ গ্রা এবং বাটখাড়াটির তলা কেটে/ ঘষে ৪০/৫০ গ্রা কমিয়ে (বাটখাড়াটির তলার সীসার ছাপ অবিকৃত রেখে) বা কখনো সীসা তুলে মোম ভরে হাতের কারচুপি ছাড়াই ঐ পরিমাণ কম দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে এই সব কাঁটা যদিও হাতে না ধরে ঝুলিয়ে ওজন করাই বিধি।

কিন্তু এর থেকে নিস্তার কিসে? ওজনে কম দেওয়া, ওজন যন্ত্রে কারচুপি করা, বাটখাড়া কেটে/ঘষে কমানো অপরাধগুলি ফৌজদারি বিধিমত সাক্ষ্য প্রমাণে আদালতে প্রমাণ না করতে পারলে কঠোর সাজার (আইনে অন্তত ৬ মাস জেল) ব্যবস্থার (যা প্রকৃত deterent) উপায় নেই, তাই স্পষ্ট যে ক্রেতাদের ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এই সব অপরাধ আদালতে প্রমাণ ইন্সপেক্টরের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া মোকদ্দমা মিটতে সময় লাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তাই ক্রেতারা সাধারণত সাক্ষী হতে নারাজ —আবার কোর্টে যাওয়া-আসা অযথা হয়রানি ও

সম্পর্ক নষ্ট। আবার তাই সাক্ষী বিগড়ে (hostile) কেস যায় কেঁচেও (যদিও এক সময় এই দপ্তরের অপর একটি বিভাগরে সাহায্য নিয়ে এই অসুবিধা মেটানোর কথা ছিল) তাই শুধুমাত্র কম দেওয়া/ ছাপ না দেওয়া ওজন যন্ত্রাদির ব্যবহার ইত্যাদি অত্যন্ত লঘু অপরাধ দেখিয়ে সামান্য অর্থদণ্ডেই কম্পাউন্ডিং করা হয় আদালতের বাইরে এবং তাও অত্যন্ত কম সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ীকে এবং ৩ বৎসরের মধ্যে তাকে আর ধরা হয় না। কারণ ৩ বৎসরের মধ্যে আবার একই ধরনের অপরাধ করলে বিচার আদালতেই হতে হবে কম্পাউন্ডিং করা যাবে না। ব্যবসায়ীরা এ তত্ত্ব ও তথ্য জানেন।

এবারে আসি বাটখাড়ার কথায়। টেলিভিশনে দেখানো হয় ও বলা হয় কাঁটা-বাটখাড়ায়, ওজন যন্ত্রাদিতে সরকারি মোহর (স্ট্যাম্প) দেখে ওজন বুঝে নিতে। কিন্তু কোথায় ও কি কি ছাপ বা মোহর থাকে এগুলোতে? বাটখাড়া ওল্টান — কাঁটার মধ্যের গর্তে —অন্যান্য ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় দেখুন —৩টি ছাপ সীসার ওপর খোদাই করা স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা। (১) সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপরে রাজ্য ও নীচে ইন্সপেক্টরের নিজস্ব পরিচয় জ্ঞাপক সংখ্যা (২) পরীক্ষা করে ছাপ দেওয়ার বৎসর সংখ্যার শেষ দুই অঙ্ক এখন ১৩ (৩) পরীক্ষার বৎসরের ৪ ভাগের কোন ভাগ A, B, C, D -এর একটি এখন A। ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার কথা থাকলেও ঐ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইন্সপেক্টরের নিজস্ব পরিচয় জ্ঞাপক সংখ্যা ঐ ছাপ থেকে উদ্ধার মনে হয় ফরেনসিক বিভাগের পক্ষেও অসম্ভব —অনেক সময় তা থাকেও না —বদলে থাকে একটি গর্ত। আর A, B, C, D বা সংখ্যা ছাপ দেওয়ার জন্য বাজারে লোহার পাঞ্চ পাওয়া যায়। বড় স্টোরেজ ব্যাটারিতে বা ট্যাঙ্ক লরির ডিপ রডে এই দিয়েই ছাপ দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরে সিল্কের সুতো বা গ্রামের ভিতর দিকের পাট ইত্যাদি কেনার কারবারীরা বাটখাড়ায় সীসা গলিয়ে ঢেলে এই রকম সংখ্যা বা অক্ষরের ছাপ দিয়ে 'কেনারাম' বাটখাড়া বানিয়ে নেন —সুতোয় দেওয়া মণ্ড বা পাটে থাকা জলের ওজনকে কাটতে। বাজারে জাল বাটখাড়ার বিক্রি বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসলের চেয়ে বেশি বলেই ভাবা হয় এবং এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতিও হয়।

বাটখাড়ার তলা কেটে বা ঘষে ২/৩ মিলি মি কমিয়ে (ছাপ নষ্ট না করে), সীসা তুলে অন্য কাল কিছু ভরে ২০০ গ্রা, ৫০০ গ্রা বা ১ কি গ্রা-তে যথাক্রমে প্রায় ২০/২৫ গ্রা, ৩০/৩৫ গ্রা এবং ৪৫/৫৫ গ্রা কমানো হয়। অনেক সময় এদের কাছে দুটো করেও বাটখাড়া থাকে দু-পাশে ব্যবহারের জন্য। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন একটি সামান্য পাতলা। ছাপ থাকা বাটখাড়া কেটে/ঘষে কমানো অন্তত ৬ মাসের জেলযোগ্য অপরাধ, কিন্তু সেই আদালতে প্রমাণের সমস্যায় এই অপরাধীরাও সামান্য অর্থদণ্ড দিয়ে (কোর্টে না গিয়ে) কম্পাউন্ডিং করেই রেহাই পান।

কেরোসিন/পেট্রোল ইত্যাদি মাপার পরিমাপগুলির ব্যাপারে সমস্যা জটিলতর। ক্রেতার কাছে সঠিক মাপের পাত্র নেই —এমন কি নতুন কেনা জগগুলিও সঠিক নয় —*নিয়ম মতো নতুনগুলি সামান্য বড় থাকার কথা —৫ লি টি অন্তত ৩০ মিলি লি বড়*। পেট্রোল পাম্পে বা কেরোসিনের দোকানগুলিতে তাই ছোট করে নেওয়া হয় তিন ভাবে (১) যে ফুটো অবধি মাপ সেটা নামিয়ে অনেক সময় পেরেক দিয়ে ফুটো করে। হাত দিলেই বুঝতে পারবেন, (২) গলা কেটে আবার ঝালাই করে জুড়ে, (৩) নীচের যোগচিহ্ন মতো যে stiffener তলা ধরে রাখার কাজ করে তার ঝালাই খুলে নীচটা ঠুকে তুলে দিয়ে অথবা তলা কেটে ফেলে পাত দিয়ে ঝালাই করে। এর সবগুলোই আগে বলার মতোই অপরাধ। ইদানিং অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয়ে নতুনগুলো মাপে কম হয়েই বাজারে আসছে। বুঝতেই পারছেন এটা আইনত হতে পারে না। সবারগুলোই কম হওয়ায় তুলনাও সম্ভব হচ্ছে না। ইন্সপেক্টরের কাছে থাকা সঠিক (ওয়ার্কং স্ট্যান্ডার্ড) এর মাপের সাথে না মিলিয়ে সাধারণ ক্রেতার কিছু বলার বা করার উপায় কম। তবে এ ব্যাপারে ক্রেতা /উপভোক্তা সংগঠন এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরকে যন্ত্র/পরিমাপসহ নিয়ে গিয়ে মাপ ও দোকানের/পাম্পের পরিমাপগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই ঠকা থেকে রেহাই সম্ভব।

এবারে আসি বর্তমানে প্রতি দু'বৎসর অন্তর এগুলি পরীক্ষা করে ছাপের কথায়। এগুলি সারানোর জন্য লাইন্সেপ্রাপ্ত মেরামতকারকেরা আছেন। বিনা লাইসেন্সে নিজেরগুলি ছাড়া কাঁটা-বাটখাড়া, ওজনযন্ত্রাদি সারানো বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইন্সপেক্টর মশাইদের এই মেরামতকারকদের উপর অগাধ আস্থা। অনেক সময়ই সারানো কাঁটা-বাটখাড়া, ওজন যন্ত্রাদি ইন্সপেক্টর মশাইরা এদের উপর ভরসা করে সময়ের অভাবে না পরীক্ষা করেই ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এদের কাছে বাটখাড়া সারানোর জন্য থাকে ৫০ কিগ্রা, ৫ কিগ্রা ও ২০০ গ্রা ক্ষমতার class B কাঁটা। ১ কিগ্রা বাটখাড়া সারানোর জন্য ৫ কিগ্রা ক্ষমতার class B কাঁটা ব্যবহার করেন। আগেই বলেছি এই রকম ৫ কিগ্রা ক্ষমতার কাঁটার সুবেদিতা (sensitiveness) ও ছাড় পাওয়া সর্বাধিক ত্রুটি (maximum error) যথাক্রমে ৯০০ মিলি গ্রা এবং ১২০০ মিলি গ্রা আর ১ কিগ্রা বাটখাড়ার সর্বাধিক ছাড় পাওয়া ত্রুটির মান মাত্র ১৫০ মিলিগ্রাম!

বিশদভাবে কাঁটা-বাটখাড়া, ওজন যন্ত্রাদির গঠন, সুবেদিতা (sensitiveness), সর্বাধিক ত্রুটি (maximum error), পরীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি ও আইন ও নিয়মের জন্য www.fcamin.in.>consumer affairs>legal metrology দেখুন।

উ মা

মেয়াদ-পেরনো ওষুধ কি বিষ?

পুলক লাহিড়ী

রাত বেশ গভীর; সন্ধ্যে থেকেই আপনার মাথা বেশ টিপটিপ করছিল। বেশি বাড়াবাড়ি হলে মাথা ব্যথা কমাবার ওষুধ খেয়ে নেব — এই ভেবে আপনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। এদিকে রাত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যথাও বাড়ছে; অগত্যা ওষুধ খেতেই হবে। আপনি মানুষটা ওষুধ পথ্য খাবার ব্যাপারে কিছুটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের, তাই ওষুধ খাবার আগে দেখে নিলেন ওষুধের মান্যতা অর্থাৎ তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার গ্যারান্টি বা এক্সপায়ারি ডেট অতিক্রম করেছে কি না। কি সর্বনাশ! ব্যথা উপশমের ঐ ওষুধটির মেয়াদ ফুরিয়েছে প্রায় দুমাস আগে! আপনার মাথায় হাত — এত রাতে ধারে কাছে কোনো ওষুধের দোকান খোলা নেই যে নতুন ওষুধ কিনবেন। অতঃ কিম! সারারাত ব্যথায় কষ্ট পাবেন নাকি 'যা থাকে কপালে' বলে ঐ সময় অতিক্রান্ত ওষুধটিই খাবেন? এদিকে এই ধারণা খুবই জনপ্রিয়, মেয়াদ-পেরনো ওষুধে শুধু কাজ হয় না, তাই নয়, ওই ওষুধ বিষ হয়ে ওঠে। খেলে অবধারিত বিপদ। এই দোলাচল আমাদের প্রায়ই ভোগায়। এবারকার প্রতিবেদন ওষুধের কার্যকারিতার ঐ সময়সীমা বিধি নিয়েই।

ওষুধের সময় সীমা পেরোনোর অর্থ কী?

ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা যে কোনও ওষুধ কতদিন অব্দি তার রোগ নিবারক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবে, তার মাপকাঠির ভিত্তিতেই ঐ সময় সীমা বেঁধে দেয়। এক নির্দিষ্ট সময় ধরে তা এক বছর, দুবছর, তিনবছর বা তারো বেশি, নির্দিষ্ট ওষুধের নিবারক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকছে কিনা, যদিই তা থাকে, তা হলে পরীক্ষাধীন সময়সীমার মধ্যে যেটি দীর্ঘস্থায়ী, তাকেই চিহ্নিত করা হয়, এবং তাই বল এক্সপাইরেশন ডেট বা সময় অতিক্রমণ। এতদ্বারা ঐ সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ওষুধটির রোগ নিবারক ক্ষমতা পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই মর্মে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা গ্যারান্টি দেয়; তার মানে অবশ্য এ নয় যে বিজ্ঞাপিত ঐ সময়ের পরে ওষুধটি অকেজো হয়ে যাবে বা বিষ হয়ে উঠবে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বস্তুত গ্যারান্টি সময়ের পরেও ওষুধের কার্যকারিতা বজায় থাকে, তবে যদি তার ব্যত্যয় ঘটে তাহলে তার দায় কোম্পানির ওপর বর্তায় না। গ্যারান্টি দেবার এই প্রথা চালু হয় ১৯৪৬ সাল নাগাদ, তবে তা বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৯৭৯ সালে আমেরিকায় ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ ডি এ) আইন মোতাবেক এই প্রথাকে বাধ্যতামূলক করে। এখন অবশ্য প্রায় সর্বত্র ওষুধের মেয়াদ-সীমা লিখে দেওয়া বাধ্যতামূলক। তা হলে সময়সীমা পেরোনো ওষুধের ব্যবহার কি ক্ষতিকারক?

ওষুধের কৌটোয় বা বোতলে লেখা কোম্পানির সময়সীমা জ্ঞাপক নির্দেশটি, নির্দিষ্ট ওষুধের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার এক ধরনের সার্টিফিকেট; তবে তার শর্ত আছে। ওষুধটিকে উত্তাপ, আর্দ্রতা ও সূর্যালোক থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং বোতল বা শিশিটিকে শক্ত করে মুখ আটকে রাখতে হবে। শিশি বা বোতলের সিল ভাঙলে কোম্পানি বাধ্য থাকবে না ওষুধের গ্যারান্টির দায় নিতে। অর্থাৎ কোম্পানি নির্দিষ্ট বিধির মধ্যে ওষুধের সংরক্ষণ না হলে, ওষুধের কার্যকারিতার গ্যারান্টি বজায় থাকবে না। এ অনেকটা বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য বিষয়ে দেয় গ্যারান্টির অনুরূপ। এর অর্থ, গ্যারান্টি সময়ের মধ্যে পণ্য বা যন্ত্রটি অকেজো বা বিকল হলে, কোম্পানি তার দায় বহন করে; সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে গ্যারান্টির ঐ রক্ষাকবচটি নিরর্থক হয়। তার মানে এ নয় গ্যারান্টি কালের পরে যন্ত্রটি খারাপ বা অব্যবহার যোগ্য হয়ে ওঠে। তার কর্মক্ষমতা অবশ্যই ক্রমশ হ্রাস পায়। ওষুধের কার্যকারিতার সময়সীমার বিষয়ও অনেকটা তাই। সময় অতিক্রান্ত ওষুধের ব্যবহার অবশ্যই ভেবেচিন্তে করা দরকার। নির্দিষ্ট সময়ের পর ওষুধ কতটা কার্যকর থাকে এ বিষয়ে আমেরিকার সামরিক বাহিনী এফ ডি এ-র পরামর্শ চায়, কেন না প্রতি বছর সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে প্রচুর ওষুধ কিনতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করলে, তা ব্যবহার না হলে নষ্ট করা হয় — এতে প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। এফ ডি এ-র তরফে ২০০০ সালে ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে কোহেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোহেন জানান যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে ২০০ বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নিয়ে এফ ডি এ গবেষণা চালায়, সময় অতিক্রমের পর তাদের কার্যকারিতা বিষয়ে। পরীক্ষিত ওষুধের শতকরা ৯০ ভাগ অতিক্রান্ত সময়ের পরেও পুরোপুরি কার্যকর থাকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের কার্যকারিতা নির্দিষ্ট সময়ের ৮ থেকে ১৫ বছর পরও অবিকৃত থাকে। ২০০৮ সালের মধ্যে মোট ৩১২টি ওষুধ পরীক্ষা করা হয় — ফলাফল প্রায় একই। তবে নাইট্রোগ্লিসারিন (যা অ্যানজাইনা জনিত ব্যথা নিরাময়ের ওষুধ), ইন্‌সুলিন (ডায়াবেটিসের ওষুধ), অ্যাড্রেনালিন (রক্তের উচ্চচাপ নির্ধারক হরমোন), কিছু তরল অ্যান্টিবায়োটিক ও আইড্রপ তাদের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়সীমার পর অনেকটাই হারায়। সময়সীমা অতিক্রান্ত টেট্রাসাইক্লিনের ব্যবহারে কিড্‌নির 'ফ্যালকনি সিন্‌ড্রোম' নামক অসুখের সৃষ্টি হতে পারে। রক্ত বা বায়োলজিক্যাল বস্তু উদ্ভূত তরলেরও কার্যকারি ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়।

না বই, না মিলন, নিছক মেলা!

উৎস মানুষের পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন : এবারের বইমেলা অনেকগুলো কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তার অন্যতম হল বেসরকারিভাবে মেলার সময়সীমা বেড়ে যাওয়া। ৩৭তম এই আন্তর্জাতিক বইমেলা যথারীতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গেই শুরু হয়। আমাদের, মানে উৎস মানুষ পত্রিকার, পুলকিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রতিবারই এমন জায়গা জুটত, লোকে খুঁজেপেতে স্টল বার করতে গিয়ে হিমশিম খেত। এবারে জায়গা পাই মিলনমেলার ভিআই পি অঞ্চলের পাশেই। (স্টল নং ১৩৭) পাশেই গিল্ডের অফিস, সামনে বিরিয়ানির দোকান। তাই 'বাম্পার সেল' হবে এই আশায় তো লাফাচ্ছিলাম।

সেই ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সটায় বিক্রিলব্ধ টাকা আঁটবে না, একটা বড় বাক্স জোগাড় করতে হবে, এমন দুশ্চিন্তাও ছিল। যাই হোক, ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের 'পুণ্য' দিনে হৈহৈ করে মেলা শুরু হয়ে যায়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমাদের স্টলও তৈরি হয়ে যায়। আড়াই-তিনজনের বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। তবে এই বাহিনীকে প্রথম দিন থেকে ময়দানে নামিয়ে বেদম করতে চাইনি বলে ঠিক করি ৩০ জানুয়ারি, যেটা বইমেলা শুরুর খাতায়-কলমে দিন, থেকে ঝাঁপ তুলব। কিন্তু এত সুখ কপালে সইল না! এক বন্ধুর এসএমএস পেলাম, অনেকেই নাকি স্টলে এসে ঝাঁপ বন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছে। এরপর আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না! ২৯ তারিখ থেকেই প্রবল উৎসাহে নেমে পড়লাম। স্টল খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল —না, ক্রেতার দল নয়। মাছি, ধুলো এবং সামনের স্টলের বিরিয়ানির থার্মোকল-নির্মিত পাত্রসকল। তাদের উৎসাহ দিতে লাগল মাইকে ভেসে-আসা অচেনা গায়কের কণ্ঠের চেনা গান, মাঝে মাঝে বেসুরো ঘোষণা।

ময়দানের বইমেলায় সোনাযুগের বাংলা গান বাজত। ঋতু গুহর কণ্ঠে 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' আনন্দ বসন্ত সমাগমের কথা সত্যিই জানান দিত। এখন আর সে সব গান বাজে না। বইমেলার সম্পদ ছিলেন দূর মফঃস্বল থেকে ছুটে-আসা মানুষের দল। তাঁরাই আমাদের মতো ছোট ছোট পত্রিকা গোষ্ঠীর স্টলে এসে বই কিনে উৎসাহ জোগাতেন। হায়, সেই দিন! মেলায় লোকের অন্ত নেই, কিন্তু তাঁদের বইয়ের চেয়ে বিরিয়ানিতে আগ্রহ বেশি। বড় স্টলে, বড় প্রকাশকের দোকানে বিরাট লাইন যথারীতি আছে। কিন্তু এবার বিস্ময়করভাবে মার খেয়েছে মাঝারি ও ছোট দোকানদাররা। বাবা-কাকার কাছ থেকে উৎস মানুষ পত্রিকার নাম শোনা ছেলেমেয়েরা স্টলে ঢুকে বইপত্র নাড়ল বটে, তবে তা যেন শুধু হাজিরা দেওয়া। বই বা বিষয় নিয়ে তাদের আগ্রহ নেই, নেই প্রশ্ন বা তর্ক। আগে বইমেলা ছিল আক্ষরিক অর্থেই মিলনমেলা। কত পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হত। এখন তাদের আসাও কমেছে। সব মিলিয়ে চিত্রটা হতাশার। তবু প্রতিবছর বইমেলা হবে, পত্রিকা টিকে থাকলে আমরাও হাজির থাকব —ব্যাপারটা ক্রমশ নিয়মরক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এভাবে কতদিন? উত্তর জানা নেই!

মেয়াদ-পেরনো ওষুধ, শেষাংশ

তাহলে করণীয় কী?

জীবনদায়ী ওষুধ এবং ওপরে বর্ণিত ওষুধ অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবহার করা উচিৎ। জ্বর-জারি, ব্যথা উপশমের ওষুধ নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি তা ঠিকঠাক সংরক্ষিত হয়। কোনও ট্যাবলেট বিবর্ণ বা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলে, কোনও তরল ওষুধ ঘোলাটে বা তা দুর্গন্ধময় হয়ে উঠলে তা ব্যবহার করা অনুচিৎ। রোদ ও আর্দ্রতা এবং কড়া আলো থেকে দূরে রাখলে বা হাওয়া ঢুকতে পারে না এমন বাক্সে ওষুধ রেখে তা রেফ্রিজারেটারে রাখলে ওষুধের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন ওষুধ কতদিনে অপচিত হতে শুরু করে সেবিষয়ে তেমন কোনো তথ্য নেই। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক, ইমিউন-ঘটিত ওষুধ বা জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ নয়। অবশ্যই এ জাতীয় ওষুধ, তার সময়সীমা অতিক্রমের আগেই ব্যবহার করা উচিৎ। রোগ যদি বড় ধরনের বা বিপজ্জনক হয়, তাহলে মেয়াদ-ফুরনো ওষুধ ব্যবহারের চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই!

শর্তের জালে বিজ্ঞান গবেষণা

তুষার চক্রবর্তী

বিজ্ঞান মানুষের জন্য। কিন্তু সময়ের ফেরে তা হয়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য। সরকার ও পুঁজিপতি এবং কর্পোরেট আঁতাত সুরক্ষিত রাখাই এখন বিজ্ঞানীদের কাজ। এই কাজ যিনি সফলভাবে করতে পারেন, তাঁর গলায় ঝুলতে পারে দেশের সর্বোচ্চ পদের পুরস্কারও। নীতিনিষ্ঠ, বিবেকবান বিজ্ঞানীরা স্বাধীনোত্তর ভারতে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাঁদের সামনে দুটো রাস্তা হয় সরকারি নীতি মানো, সরকার-পোষিত নীতি জয়গান গাও, নয় উচ্ছন্নে যাও। পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, বিদেশ-যাত্রার লোভনীয় প্রস্তাব ফেলে কে আর জনবিরোধী পারমাণবিক শক্তি বা জি এম শস্যের বিরোধিতা করে! তাই ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার ভবিষ্যৎ বেশ অন্ধকার। কিছু আবিষ্কার বা প্রযুক্তির চমৎকারিত্ব হয়ত দেখা যাবে, তবে তাতে সাধারণ মানুষের উল্লসিত হওয়ার মতো কিছু থাকবে না।

যা বতীয় বিজ্ঞান গবেষণার উৎসে রয়েছে মানুষের বিস্ময় কৌতূহল। স্বাধীনতা না থাকলে কৌতূহল বা প্রশ্ন বেড়ে ওঠার সুযোগ সুবিধে তেমন পায় না। সমাজ, রাজনীতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এদের সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাশক্তির যে যোগসূত্র, বিজ্ঞানের পালন ও বর্ধনে তাদের ভূমিকা ঠিক সেই কারণেই অনেকখানি। যদিও বিশুদ্ধতার নামে বিজ্ঞানচর্চাকে সমাজ ও রাজনীতির থেকে দূরে রাখার পাইকারি প্রবণতাকে এ যুগে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। অনেকে অক্লেশে ধরেই নেন, সেটাই যেন বিজ্ঞানের স্বাধীনতার নিহিতার্থ। আর তা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ক্রমশ আরো বেশি বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে অনেক রকম অদৃশ্য শর্তের জালে। এই সব জাল কেটে বেরিয়ে আসতে না পারলে আজকের বিজ্ঞান সমাজ এবং পরিবেশকে প্রার্থিত প্রগতির রাস্তা থেকে বরং অধোগতির দিকেই ঠেলে দেবে। যা বহু ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। সত্যি বলতে গেলে, বিজ্ঞানের স্বাধীনতার নামে বিজ্ঞান গবেষণাকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ভুল পথটি যেদিন থেকে বেছে নিয়েছি আমরা, সেদিন থেকেই এই সব অধোগতির লক্ষণ চোখের সামনে আরো বেশি করে ফুটে উঠছে। কুফল সকলেই দেখছি, কিন্তু যথার্থ কারণটা সনাক্ত করতে পারছি না।

যেমন, ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাপর্বের কথাটাই ধরা যাক। সকলেই জানি যে সেটা হয়েছিল পরাধীন দেশে। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও শর্তের মধ্যে সেদিন বিজ্ঞানীদের কাজ করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও তো সেদিন বিজ্ঞান এ দেশের মাটিতে ফলিয়েছিল সোনা। কীভাবে এটা ঘটল সেটা একটা প্রশ্ন। আরো জব্বর প্রশ্ন হল, ঔপনিবেশিক প্রভুরা বিদায় নেবার পর, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের আপাত- অনুকূল পরিবেশে কী ঘটল? স্বাধীনতা এল, সেখানে বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ সুবিধার বিস্তার ঘটল অনেকখানি—কিন্তু বিজ্ঞানের সাফল্যের ছবিটা দিনে দিনে কেন ম্লান হয়ে এল? মানুষ হিসেব চাইলে, অতীতের সাফল্য ভাঙিয়েই আজকের ভারতীয় বিজ্ঞানকে পিঠ বাঁচাতে হয়। বলতে হয় জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুদের নাম। স্বাধীন দেশের তুলনায় পরাধীন দেশে ভারতীয় বিজ্ঞানের সাফল্যের সূত্রটা তাহলে কী? সেটা কি আমাদের প্রথমোক্ত প্রত্যয়টিকেই ধূলিসাৎ করে দেয় না?

হেঁয়ালির সমাধানটা সহজ হয়ে আসে যদি আমরা বিজ্ঞানের জমি হিসেবে সতেজ এবং স্বাধীন মননের মূল তত্ত্বটির দিকে আরেকবার ফিরে তাকাই। সকলেই জানি, পরাধীন দেশে মনের স্বরাজ অক্ষুণ্ণ রাখার তেজ এবং জাতীয়তাবোধ কয়েকজন সফল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এতটাই প্রবল ছিল যে তাঁরা সমকালীন প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করে স্বর্ণপ্রসু গবেষণা চালাতে সফল হন। অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্র-আরোপিত কোনো শর্তের জালে বা প্রলোভনে তাঁরা সেদিন নিজেরা জড়িয়ে পড়েন নি। দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তফাৎটা তাঁদের কাছে সেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে দেশ এবং রাষ্ট্রের সেই তফাৎটাই একটু একটু করে অন্য অনেকের মতো, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মন থেকেও ক্রমশ হারিয়ে গেছে। আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিঃশর্তে মান্য করাটাকেই অনেকে মনে করি দেশসেবা। অন্য অনেকের মতো বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই ভুলটা ক্রমশ গেড়ে বসেছে।

আমাদের এই যুক্তি যদি ঠিক হয় তা হলে আরো প্রশ্ন উঠবে, দেশসেবার নামে যে রাষ্ট্রসেবায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আজ নিজেদের নিযুক্ত করছেন সুযোগ পেয়ে সেই সর্ষের মধ্যেই কী তাহলে বাসা বেঁধেছে ভূত? একটু হিসেব নিলেই কিন্তু তেমন প্রমাণ হাতেনাতে পেতে পারি। দেখব, অন্যান্য আরো অনেক দেশের মতো আজকের ভারতেও বিজ্ঞান গবেষণার রসদ জোগাচ্ছেন দেশের মানুষ। কিন্তু সমর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও দেশি বিদেশি একচেটিয়া লগ্নীর কারবারিরা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রকে কীভাবে কব্জা করে, আড়াল থেকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে নিজেদের স্বার্থে চালনা করছে। ফলে, দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নীতি চালিত হচ্ছে ভুল লক্ষ্যে। গবেষণার মধ্যে ফুটে উঠছে অসুস্থতার লক্ষণ। অবস্থা এতটাই খারাপ যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক পুষ্পমিত্র ভার্গভকে সম্প্রতি বলতে হয়েছে, ভারতে বিজ্ঞান-পরিচালিত হচ্ছে একদল মাফিয়ার হাতে!

ভারতে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান স্বাধীনতার পরের পর্বে, নেহেরুযুগে গড়ে ওঠে এবং ক্রমশ ব্যাপ্তি পায় তার রাষ্ট্রনির্ভরতা যেমন অত্যন্ত বেশি, তার ওপর, আমলাতন্ত্র তাকে শক্ত হাতে বেঁধে রেখেছে। দেশের উন্নতির কথা অহরহ মুখে বলা হয় বটে কিন্তু কাজের বেলায় জনস্বার্থরক্ষা নয় — রাষ্ট্রশক্তিকে মজবুত করাটাই হয়ে উঠেছে তার প্রধান কাজ। যে রাষ্ট্র, মূলত দেশি-বিদেশী অতি বিত্তবানদের পাহারাদার। এটা শুধু ভারতে ঘটছে এমন নয়, তথাকথিত উন্নত পশ্চিমী দেশেও এটা ঘটছে। তবে পশ্চিমের দেশে, এই নিয়ন্ত্রণটা করা হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে। যাতে তার আঁচটা অধিকাংশ গবেষক টের পান না। ফলে, গবেষণার একটা আপাত স্বাধীনতা সেখানে বজায় থাকে। থাকে আরো অনেক রকম কৌশল। কাজটা সুচারু ভাবে করবার জন্য একটা আস্ত বিজ্ঞান পরিচালনার বিজ্ঞান সেখানে গড়ে নেওয়া হয়েছে। যেটি নিয়ে খুব বেশি খোলামেলা আলোচনা হয় না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীও এই নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের সঙ্গে সেখানে অপরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের একটা বড় অংশ ভিনদেশি বলে সেখানে নিয়ন্ত্রণের কাজটা অনেক বেশি দক্ষ এবং সহজ হয়ে গেছে।

ভারতে রাষ্ট্রস্বার্থ ও প্রতিরক্ষার দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমী অ্যাংলো-আমেরিকান মডেলটাই বেছে নেওয়া হয়েছিল। আর এর নিয়ন্ত্রক হিসাবে নেহেরু যুগ থেকে যাঁদের ওপর নির্ভর করা হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন নিছক মধ্যমেধার বিজ্ঞানী। মেঘনাদ সাহা বা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো যাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান প্রতিভা ও দেশপ্রেমের গরজ দুটোই ছিল, তাঁদের তাই একেবারে প্রথম থেকেই বিজ্ঞান পরিচালনার কাজে বা বিজ্ঞাননীতি প্রণয়নের সর্বোচ্চ স্তরে একেবারে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। ফলে, একদল দুর্নীতিগ্রস্ত, স্তাবক ও মোসাহেব —ভারতের ১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু করে নবনির্মিত প্রতিটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান দখল করে অন্যদের ওপর ছড়ি ঘোরাবার কাজে মেতে উঠলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা নেচারের এক সম্পাদক, গত শতকে একবার ভারতে এসে, এ সব নিজের চোখে দেখে, ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ওপর নেচার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি ভারতের এই বিজ্ঞান পরিচালকদের বলেছিলেন —সায়েন্স-মান্দারিন। চিনের মান্দারিনদের মতো এদের মধ্যে দস্যুবৃত্তি, অন্যদের দাবিয়ে রাখা ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রবণতা তাঁর কাছে স্পষ্টত ধরা পড়েছিল। আজকের খোলা অর্থনীতি ও বিদেশী লগ্নির যুগে এই সায়েন্স মান্দারিনদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ খানিকটা কমেছে বটে, তবে আদতে এরাই এখন হয়ে উঠেছে কর্পোরেটদের হয়ে কর্মরত মাফিয়া।

ভারতের আজকের বিজ্ঞান গবেষণা রাষ্ট্র, ব্যবসায়ী ও লগ্নিকারীদের শর্তে সদাসর্বদা তাঁদের হয়ে না হলেও অন্তত তাঁদের স্বার্থ বাঁচিয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে মান্দারিন বা মাফিয়া পরিবেষ্টিত এই জগতে বিজ্ঞানচর্চার সুস্থ এবং স্বাধীন পরিবেশটাই আজ আর বেশির ভাগ জায়গায় নেই।

এই পরিস্থিতিতে ভারতে বিজ্ঞান যে এগোবার বদলে পিছিয়ে যাচ্ছে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ২০১০ বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৯৭তম অধিবেশনে সেটা নিজমুখে স্বীকার করেন। বলেন : "It is unfortunately true that red tape, political interference and lack of proper recognition of good work have all contributed to a regression in Indian science in some sectors from the days of (Nobel laureate) C V Raman and other great pioneers of Indian science" (দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে লাল ফিতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রকৃত ভাল কাজের স্বীকৃতি না দেয়া, এই সমস্ত কিছুর ফলে নোবেলে জয়ী সি ভি রমন এবং অন্যান্য ভারতীয় মহান পথিকৃৎ বিজ্ঞানীর তুলনায় ভারতে বিজ্ঞান বেশ কিছু শাখায় পিছিয়েই চলেছে)। এমন কি এটাও বলেন : "I invite you to explore all these issues and engage with us to liberate Indian science from the shackles of deadweight of bureaucratism and in-house favouritism," (আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে এই সব সমস্যা নিয়ে আপনারা তল্লাসি করুন এবং ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানকে আমলাতন্ত্র ও ঘরোয়া স্বজনপোষণের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সঙ্গে কাজ করুন)।

এ সব যে অত্যন্ত সুপরামর্শ তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু যে ধরনের সৎ ও চক্ষুষ্মান বিজ্ঞানীকে তিনি আপাতদৃষ্টিতে শুদ্ধীকরণের জন্য আহ্বান করছেন, তাঁরা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানপাপী। এই সব অপকর্ম কোনোটাই তাঁর অগোচরে ঘটছে না। বস্তুত, উপরোক্ত কথা তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এই

জন্য যে সদ্য নোবেলজয়ী চন্দ্রশেখর ভেংকটরামন সে সময় খোলাখুলি বলেন যে, "autonomy from red tape and local politics" (লাল ফিতে ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে মুক্তি) ছাড়া ভারতের বিজ্ঞানের দুর্দশা ঘোচার নয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কোনো ভারতীয় ইঁদুর (বিজ্ঞানী) অতঃপর এগোয় নি। এ কাজে নামলে যে চাকরি খোয়াতে হতে পারে, সেটাও তাঁদের অজানা নয়।

ভারতে ১৯৫০-১৯৮০-র পর্বে, বিজ্ঞানের কাঠামো নির্মাণ ও বিস্তৃতির মধ্যে যদিও স্বাবলম্বন, জাতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং সমাজ থেকে যাবতীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের সংকল্প বারংবার ঘোষিত হয়েছিল —এমন কি বিজ্ঞান মনস্কতাকে নাগরিক কর্তব্য হিসেবে সাংবিধানিক নথিভুক্ত করানো হয়— কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভারী-শিল্প, বৃহৎ-বাঁধ এবং বিজ্ঞান-প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। প্রতিটি কাজ ছিল প্রায় ১০০% বিদেশী ঋণনির্ভর। আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা ও মানসিকতা এই পর্বে যেভাবে ঋণদাতা দেশগুলির মুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হয়ে ওঠে তা ভারতে ব্রিটিশশাসিত যুগেও কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না। এই পর্বে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ঘটল তার উপকরণ পাঠ্যবই, গবেষণা গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি, অন্যান্য রসদপত্র সবটাই সংগ্রহ করা শুরু হল বিদেশ, বিশেষত আমেরিকা থেকে। যার মূল কারণ ছিল ঋণের শর্ত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অজ্ঞাতসারে এই শর্তের জালে জড়িয়ে বিদেশমুখী হয়ে উঠলেন। আর্থিক পরাধীনতা ছিল এই আবহাওয়া তৈরির আসল উৎস। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি সরকার একদিকে প্রতিষ্ঠান মারফত এই সব ঋণের টাকা নয়ছয় করা শুরু করল, অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক দাসত্ব দিয়ে চাপা দিল সেই সব দুর্নীতি। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বিজ্ঞানীদের স্বাধীন কাজ করার সুযোগটা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল। ঋণের বোঝা লাগামছাড়া হবার সঙ্গে সঙ্গে ইমপোর্ট সাবস্টিটিউশন বা বিদেশি পণ্যের দেশীয় নকল তৈরি করাকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করাটা ছিল ভারতে উন্নত মানের বিজ্ঞান গবেষণার কফিনে ঠুকে দেয়া শেষ পেরেক। এই নকলনবিশি কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানী বা উদ্ভাবকের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। মুখ থুবড়ে পড়া এই অর্থনীতি ও বিজ্ঞান দুটোকেই কব্জা করার এক নতুন অধ্যায় আনল বিশ্বায়ন। ভারতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে বিশ্বায়নের যুগে লগ্নীকারক কর্পোরেট প্রভুদের হাতে এখন প্রায় ফাউ হিসেবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে সব কর্পোরেট সংস্থা ভারতে লগ্নী করতে আসছে তারা শিল্প দখল, ব্যাঙ্ক দখল ও বাজার দখলের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকাঠামোটিকেও দখল করে নিচ্ছে। এবং বিজ্ঞানের নামে, প্রযুক্তির নামে তাঁরা যুক্তিসঙ্গত করতে চাইছে নিজেদের আগ্রাসন।

একুশ শতকে পা দেওয়ার পর, মার্কিন-ভারত পরমাণু চুক্তি এবং মার্কিন ভারত কৃষিজ্ঞান চুক্তি এই দুটি চুক্তি প্রায় একই সময়ে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হল। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই সব চুক্তি-দায়গ্রস্ত। যেহেতু, যে কর্পোরেট লগ্নীকারকদের ভারত লুণ্ঠনে সমাদরে তিনি ডেকে এনেছেন তাঁরা অধিকাংশ মার্কিনি (মনসান্তো, ওয়ালমার্ট, জেনারেল ইলেকট্রিক, এ আই জি ইত্যাদি) এবং আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক গোটা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক তাই কোম্পানি ভারত বা ইন্ডিয়া-ইনক-এর তরফে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরিকার প্রধানমন্ত্রীকে সাক্ষী রেখে, পাহারায় রেখে উক্ত কর্মসূচি লাগাতার এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

তাই, ভারত সরকার চান যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারতবাসীকে বোঝাক যে নিউক্লিয়ার শক্তি অত্যন্ত নিরাপদ। নাগরিকদের বোঝানো হোক চের্নোবিল ও ফুকুশিমার পারমাণবিক চুল্লি বিস্ফোরণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হলেও তাতে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নি। ভারত সরকার চায় যে বিজ্ঞানীরা বলুক যে জিন-বদলানো জি এম খাদ্যশস্য অত্যন্ত নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব। বলুক, বিটি শস্য চাষ না করলে কৃষকদের উন্নতির অন্য কোনো রাস্তা নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ যদি এর উল্টো সাক্ষ্য দেয় তবুও তাদের এই রাষ্ট্রীয় বয়ান বলতে হবে। যদিও মনমোহন সিং বলবেন না, যে এই বয়ান এই কারণে বলতে বলা হচ্ছে, যেহেতু তাঁরা উপরোক্ত চুক্তিতে সই করেছেন। তিনি বলবেন, এতে ভারতের উন্নতি হবে! ভারতের উন্নতি মানে কার উন্নতি সেটা তাঁকেই প্রশ্ন করা দরকার।

ভারতে ১৯তম জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে দিল্লীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর বিজ্ঞানীদের ডাক দিয়েছিল —দেশ জুড়ে নিউক্লীয় শক্তি কত নিরাপদ তা প্রচার চালাতে। এ বছর ২০তম জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে তাঁরাই ডাক দিয়েছেন জি এম শস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রচার চালাতে। কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ভারতের বিজ্ঞানীরা এই ডাকে গত বছর সারা দেন নি। এ বছর দেবেন এমনটাও মনে হয় না। সচরাচর চন্দ্রশেখর ভেংকট রামনের আবিষ্কার উপলক্ষে এই বিজ্ঞান দিবসটি যেহেতু নির্বাচিত, তাই সেই আবিষ্কার বা বিজ্ঞানের অন্য কোনো সাড়া জাগানো আবিষ্কার নিয়ে আলোচনায় তাঁরা উৎসাহ দেখান। এ বছর আলোচনার কেন্দ্র কার্যত দখল করে রেখেছে হিগস বোসন অনুসন্ধান। তবে : আজ দেশের সার্বিক অর্থনীতি এবং পরিবেশ যে সংকটের মধ্যে প্রবেশ করেছে —তাতে অসাধু রাষ্ট্র নির্দেশের সামনে নিশ্চেষ্টতা, অনীহা বা অসহযোগ দেখানোটাই যথেষ্ট নয়। এই সব অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি মত প্রকাশ করাটাও সমান জরুরি। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানের স্বার্থে এই সব শর্তের জাল উত্তরোত্তর ছিঁড়ে দেয়াটাই আজ বিজ্ঞানীর দায়িত্ব হিসেবে উঠে আসছে।

(অকালপ্রয়াত, বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গী ও একান্ত বিজ্ঞানমনস্ক অধ্যাপক সুবীরকুমার সেনের স্মৃতিতে আলোচনাটি নিবেদিত হল)

আসুন আনন্দ পাঠশালায়

প্রবীর ভট্টাচার্য

‘এই মেয়েটা, নাম কিরে তোর’?

কোলে অন্য একটা বাচ্চার ভারে প্রায় বেঁকে যাওয়া বছর দশেকের মেয়েটি উত্তর দিল, ‘কাজল’। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, হাতে-পায়ে ঘা-প্যাঁচড়া। মুখে একগাল হাসি। এক হাত প্রসারিত ভিক্ষে পাবার আশায়, অন্য হাতটি ছোট বোনকে জাপটে ধরে আছে।

‘কোথায় থাকিস রে’?

‘অই ওখানে’।

কথাক্রমে জানা গেল, বি টি রোড রথতলার ধারে পুরানো বাতিল পি ডব্লু ডি-র ভাঙা কোয়ার্টারে গাদাগাদি করে থাকে কয়েকটি পরিবার। কাজলরাও থাকে। কোলে নির্জীব বোনটির ঔপনিষদিক নাম অমৃতা। এই অমৃতের সন্তানের জন্মের পর মা শান্তি দাস শিরদাঁড়া ভেঙে মারা যান। কাজল যদিও বলে ‘ভূতে কেটেছিল’। তারপর থেকে কাজলই অমৃতাকে কোলে-পিঠে করে বড় করছে। বাবা মুন্না দাস মুরগি কাটে, ভ্যান চালায়। তারপর সারাদিন মদ খেয়ে তদোচিত ক্রিয়াকর্ম করে। সন্তানদের ব্যাপারে উদাসীন। আবর্জনা আর দুর্গন্ধযুক্ত একটা চৌখুপিতে কোনোরকমে কয়েকটা ইটের ওপরে একটা তক্তা পাতা। ওরা দুই বোন সেখানেই শোয়। দরজা-জানলায় বস্তা ঝুলিয়ে দেওয়া। যাতে ঠাণ্ডা বা বৃষ্টি আটকানো যায়। ভাগ্যক্রমে মাথার ওপর পাকা ছাদ। এদিকে, শোনা গেল বি টি রোড বাড়াবার কাজে এই বাড়িগুলি ভেঙে দেওয়া হবে, তখন পরিবারগুলোর কী হবে, কোথায় যাবে? একটাই সান্ত্বনা যে, পথশিশুকে গৃহশূন্য করা সবদিক থেকেই অসম্ভব। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই আরো কয়েকজন কাজল ওখানে চলে আসে। আসে ওইরকমই কোলে বাচ্চা নিয়ে এক মেয়ে। নাম বাসন্তী। বাবা মহেশরাম রিকশাচালক, মা যমুনা বাড়ি বাড়ি কাজ করেন। কোলের বাচ্চাটি ছাড়াও বছর তিনেকের আরো একটি ভাই আছে। এর পৌরাণিক নাম কার্তিক। বাসন্তী সৌভাগ্যক্রমে স্কুলে ভর্তি হলেও, ভাইদের দেখাশোনা করার জন্য নিয়মিত যেতে পারে না। আরও একজন ওই বয়সী মেয়ে, নাম সোনিয়া। বাবা-মা দুজনেই মৃত। বাসন্তীদের সঙ্গেই লেপ্টে আছে। সম্পর্কে কীরকম একটা পিসি হয়। এছাড়াও আরও দুটি মেয়ে ওখানে থাকে। মমতা আর সুইটি। মমতার বয়স দেখলাম ১৩-১৪-র কাছাকাছি। সুইটির বছর ছয়েক। কেউ-ই ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষার অধিকারস্থ হয় নি।

পরদিন কাজলকে দেখলাম, মিষ্টির দোকানে বাসন মেজে মজুরি হিসেবে বাসি ভাঙা জিলিপির টুকরো খাওয়ায় ব্যস্ত। হঠাৎ সমবয়সী বেশ কয়েকটি ছেলের দিকে বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে কাজল ঝাঁপিয়ে পড়ল। মারামারি, খামচাখামচি। একটা আধলা ইট ছুঁড়ে কাজল ছোট বোনকে কোলে নিয়ে সঙ্গে ভাঙা জিলিপির টুকরোগুলো নিয়ে ধাঁ। বাকিরা তখন হামলা শুরু করেছে মিষ্টির দোকানে। ভাঙা জিলিপি আর বাসি সন্দেশের আশায়। দোকানি একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই সকলে দৌড় দিয়েছে।

এই দৌড়ের মাঝেই একটাকে ধরা গেল।

‘অ্যাই! ইস্কুলে যাস’?

‘যাই তো। পয়সা দাও লাড্ডু খাব’।

‘রাস্তায় ঘুরছিস, ঘর কোথায়’?

‘এখানেই থাকি’।

‘মা, বাবা কোথায়’?

‘বাবা মরে গেছে, মা কাজ করে, পয়সা দাও না, লাড্ডু খাব’।

কিছু না পেলে উত্তর পাব না বুঝে ওদের সবাইকে নিয়ে বসলাম মিষ্টির দোকানেই। একটু পরে, গুটি গুটি পায়ে অমৃতাকে নিয়ে কাজলও হাজির। ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সরেস সঞ্জয়।

বায়স ১২-১৩-র মধ্যে। এক দাদা আছে। বাজারে মুরগি বিক্রি করে, বউ নিয়ে আলাদা থাকে। সঞ্জয় মা আর দিদার সঙ্গে রামকৃষ্ণ কলোনিতে থাকলেও বসত রাস্তায়। সায়ন বলে ওর সমবয়সী একটা ছেলেকে সবাই ডাকছিল ভাণ্ডারি বলে। সায়ন বাবাকে দেখে নি কখনও। মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেছেন কিছুদিন আগে। এক দাদা চুরি করে মার খেয়ে পাড়া ছাড়া। দুর্দশাভগ্ন পরিবারের উচ্ছিষ্ট সায়ন এখন দিদার কাছে থাকে। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল গুট্‌খা ও নিকোটিনের নেশা ধরে ফেলেছে। অন্য নেশাও হয়তো আছে! পিন্টু বলে কালো ঢ্যাঙা ছেলেটির বয়স মনে হচ্ছে এদের চেয়ে একটু বেশি। হলুদ ছোপ পড়া দাঁতগুলিকে বার করে সবসময়ই সে হাসছে। বাঁ হাতটা ছোটবেলায় ভেঙে যাবার পর ঠিকমতো না জুড়তে পারায় বেঁকে গেছে। এর অবশ্য মা-বাবা দুই-ই আছে। কাজলদের পাশের ঘরে থাকে। পরপর চার ভাই-বোন। পিন্টুর পর আকাশ, রাহুল আর কোলের ছোটটা বোন অঞ্জলি। বাবা বাপি ঘোষ লরির খালাসি, মা জ্যোৎস্না বাড়ি বাড়ি কাজ করেন। বড় বোনটাকে খাওয়াতে পড়াতে পারবে না বলে নওদাপাড়ার কোনো দিদিমণির কাছে দিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এটা শোনা কথা। সম্ভবত পাচার হয়ে গেছে। আরও দুটি ছেলে রাজ ও মহেশ। বাবা শম্ভু পণ্ডিত ফুটপাতেই 'জেনিথ' হাসপাতালের কাছে দুই ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। রিকশা চালাতেন। বছর দুয়েক হল মারা গেছেন। তাদের মা পূর্ণিমা দুই মেয়েকে নিয়ে বহুদিন আগেই এলাকা ছাড়া। এই বৃত্তান্তের মধ্যেও পাচারের ব্যাপার আছে। এদিকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে মহেশ ও রাজ জীবন কাটাচ্ছে। বোঝা গেল, উদ্ধার করতে না পারলে এ দুটিরও গতি হবে অন্ধকার জগতে।

পাঠকদের বলে রাখি, যে সমস্ত নাম এতক্ষণ ধরে লিখেছি সবই আস্ত জ্যান্ত মানুষের সাচ্চা নাম। পরিচয় গোপনের আত্মসম্মানী ভড়ং এদের জন্য দরকার নেই। মানবসন্তানদের এ ধরনের বৃত্তান্ত কলকাতার পথে ঘাটে যে সুলভ এ কথাটি কেউ অস্বীকার করবেন না এটাও আশা করি।

ক্রমে ক্রমে জানা গেল স্থানীয় 'জাতীয় শিশু শ্রমিক স্কুল'-এ ওদের কারও কারও নাম খাতায় তোলা থাকলেও আদতে কেউ-ই সেখানে যায় না।

'যাস্ না কেন'?

'স্যার মারে'।

'অ্যাত্তো বড় লাঠি দিয়ে দড়াম দড়াম করে মারে'।

'আমরা ওখানে আর যাবো না।'।

দু-পাঁচদিন পর যখন বলা গেল যে তোদের নিয়ে একটা স্কুল খুললে বেশ হয়। যেই বলা, সবাই ছেঁকে ধরল, 'আজ! আজ! আজই যাব তোমার স্কুলে'!! আনন্দ যেন ধরে না। অমৃতাকে কোলে নিয়ে কাজল বলল, 'আমাকেও লিতে হবে। বনকে সঙ্গে লেবো। ও কিছু করবে না। কলে থাকবে'।

এক-দুই করে গুনতে গিয়ে দেখলাম জনা ১২-১৩ সংখ্যা হচ্ছে। এতজন শিশু সুবিখ্যাত বি টি রোড রথতলার মোড়ে থেকেও স্কুলে যায় না! অথচ চারিদিকে স্কুলের কোনো অভাব নেই। বিদ্বান সচেতন মানুষের ভীড়ে পথ চলাই দায়। আর দেশোদ্ধারকর্তাদের ছবির ঠেলাঠেলিতে আকাশও দেখা যায় না। তবুও ...

পড়াব তো বললাম। কিন্তু কোথায় পড়াব? জায়গা কই? নাটকদলের বন্ধু প্রতাপ, গাড়ি চালায় এক ধনী মহিলার। ফিডার রোডের ওপর তাঁর বিশাল বাড়ি। নিচের তলায় কিন্ডারগার্টেন স্কুল। সেখানে একটা ফাঁকা গ্যারেজ ঘর আছে। গাড়ি অন্যত্র থাকে। দিনের বেলায় হবে না, তবে, সন্ধ্যেবেলায় স্কুল বসলে গৃহকর্ত্রীর সমস্যা নেই। ছোট্ট ঘর। দাঁড়ালে আমাদের মাথা ঠেকে যায়। তাই সই। রবীন্দ্রনগর কলোনির ছেলেমেয়েরা, শিল্পী বন্ধু অতীশ-রঞ্জনার তদারকিতে ঘরটায় এঁকে ফেলল রঙ্গীন মাছ আর জলজ উদ্ভিদ। তৈরি হয়ে গেল একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। যদিও চেয়েছিলাম খোলা আকাশ আঁকা হোক। যাই হোক, ২ জানুয়ারি, ২০১২, সোমবার হইহই করে, কেক কেটে, বেলুন ফুলিয়ে উদ্বোধন হল 'আনন্দ পাঠশালা'র। ছাত্র-ছাত্রী ১৫ জন। আগেরগুলো ছাড়াও এল আরও দু'জন। জিৎ আর তারক। সারদা মঠের পেছনে থাকত ওরা। বাবা শিবু ব্যানার্জী রিকশাচালক। মা শিখা বাড়িবাড়ি কাজ করেন। গায়ে আগুন ধরিয়ে শিবু আত্মহত্যা করার পর, বাড়িওয়ালা দুই ছেলেসহ শিখাকে ঘর থেকে বার করে দেয়। তারক প্রতিবন্ধী। কথা বলতে ও হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। থাকার জায়গার অভাবে ও অন্য নানা সহজবোধ্য কারণে দুই ভাই-এর স্কুল যাওয়া হয় নি। আমাদের কাছে ওরাও এসে জুটল।

দিদিমণি ঠিক হল। রোজ সন্ধ্যেয় আসবেন। কারো বইখাতা আনার দরকার নেই। সে সব থাকবে আমাদের কাছেই। রোজ ক্লাসের শুরুতে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুতে হবে। ঘরের পাশে উঠোনে মস্তবড় চৌবাচ্চা। সেখানেই তার বন্দোবস্ত হল। পড়ার জন্য পাওয়া গেল ছোট ছোট চেয়ার-টেবিল। ঠিক হল শুরুতেই চোখ বন্ধ করে ধ্যান। হাত জোড় করে প্রার্থনা সঙ্গীত। কখনো নৃত্য-গীত, খেলা ইত্যাদি। তারপর ছড়া, বর্ণপরিচয়। বাসন্তী আর সঞ্জয় ছাড়া আর কারও অক্ষর পরিচয় নেই। পেনসিল ধরতেই শেখে নি। দশ পর্যন্ত গুনতেও পারে না। আস্তে আস্তে এ সবই চলতে লাগল। পড়া শেষে হাল্কা টিফিন নিজের ও বান্ধবজনের সহায়তায়।

এ ভাবেই একমাস কাটিয়ে চলে এল সরস্বতী পূজো। রবীন্দ্রনগরের মেয়েরা এবং আনন্দ পাঠশালার সবাই চমৎকার আয়োজন করল পূজোর। সেদিন ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার।

সন্ধ্যেবেলায় নাচ-গান-কবিতা-মূকাভিনয়। হই হই রই রই। সেই সময়ই খেয়াল হল কাজলের বোন অমৃতার মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। দু'দিন ধরে গায়ে ধুম জ্বর। এই অবস্থাতেই এসেছে। বন্ধু রঞ্জন-লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ওষুধ, ইঞ্জেকশন সব কিছুতে সামলানো গেল অবস্থা। কিন্তু ক্ষীণ জীবনীশক্তিধারিণী অমৃতার প্রয়োজন যত্নের। পুষ্টির। কী করে ব্যবস্থা করা যায়। সলতে পাকিয়ে গরম দুধে ভিজিয়ে টানা দু'দিন খাওয়ানোর পর বেঁচে গেল মেয়েটা। রঞ্জনদের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজে সাহায্য করল সাধনাদিও। কাজল মাতৃহীন বোনটির পাশে স্থাণুর মতো বসে রইল টানা দু'দিন। এক মুহূর্তেও বোনকে কাছ ছাড়া করে নি। ওদের বাবার অবশ্য খোঁজই পাওয়া গেল না।

এ ঘটনার পর শহরের নামী পুষ্টিবিদ, আমাদের দুই দিদির পরামর্শ মতো সকলের উচ্চতা ও ওজন নেওয়া হল। চরম অপুষ্টির শিকার সব শিশুদের জন্যই এবারে বন্ধুবান্ধব এবং চতুর্দিকের হিতার্থীদের ধরে পড়ে ব্যবস্থা হল দুধের। সাধনা দি, কাচের শিশিতে দুধ আনতেন। অমৃতা বাদে সকল শিশুকে আলগা করে কয়েক ঢোক দেওয়া হত। শেষে ছোট্ট বাটিতে বিস্কুট ভিজিয়ে অমৃতার বরাদ্দ। দুধ খাওয়ানোর সময় সকলের হুড়োহুড়ি লেগে যেত। আয়োজন কম, প্রার্থী অনেক। 'ম্যাম আমাকে কম দিলে। আর একটু দাও'। এমন আবদার রোজ শুনতে হত। প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণের জন্য পুষ্টির দিদিরা হাতে গড়া রুটি-তরকারি খাওয়াতে বললেন। লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে? প্রতিদিন কে রুটি-তরকারি করে, কে খাওয়ায়? স্কুলের পাশেই ফিডার রোডের ওপর অন্তত গোটা পাঁচেক রুটির দোকান। কিন্তু আশ্চর্য এক এক করে সব কটি রুটির দোকান-ই নগদ পয়সা পেলেও বাচ্চাদের খাওয়াতে অস্বীকার করল। আমরা ভেবেছিলাম, পড়া শেষে সকলে দোকানে খেয়ে যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। নোংরা জামা-কাপড়, উস্কো-খুস্কো পথশিশুদের সঙ্গে একাসনে খেতে প্রবল অনাগ্রহ পাড়ার ভদ্রজনদের। দোকানি-ই বা কি করে! খদ্দের বলে কথা! একটা দোকানে তো কাজল জলভর্তি খাবার জলের বালতি ছুঁয়ে ফেলায় ভদ্রলোকদের কী রাগ! পুরো জল ওখানেই ফেলে দিল। মাঘের শীতে আবার জল কোথায় পাবে সেই চিন্তায়, চিৎকার করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল বাচ্চাদের। পয়সা আগাম দেওয়া, তবু আমাদের দিদিদের কোনো অনুরোধেই কান দিল না। আর একটা দোকান বলল, 'আহা রে! ছোট বাচ্চারা কোথায় যাবে। আমি-ই খাওয়াব। সব খদ্দের চলে গেলে বেশি রাতে আসুক। আমার হাতে হাতে ছোট-খাটো দু-একটা কাজ করে দেবে। বাসন মেজে দেবে, জল তুলে দেবে'। —কে বলে আমাদের শরীরে দয়ামায়া নেই?

খাওয়ানো নিয়ে এ সব ঝামেলার মধ্যে অন্য বিপদও দেখা দিল। গৃহকর্ত্রী বললেন, উঠোনের চৌবাচ্চায় বাচ্চাদের হাত-পা ধোওয়ানোর দরকার আছে কী? পাশের বাড়ি আপত্তি করছে। বিষয়টা হল, পাঁচিলের ধারে বিশাল চৌবাচ্চায় সাবান দিয়ে হাত-পা ধোওয়া আমরা আবশ্যিক করেছিলাম। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে তা ছিল চরম মজার। হুটোপুটিতে অভ্যস্ত শিশুরা কিছু হট্টগোল করত। তাতে পাঁচিলের ও-পাশের দ্বিতল বাড়ির ওপরতলার গিন্নির সান্ধ্যঘুমের ব্যাঘাত হত। তেনার প্রবল আপত্তিতেই বন্ধ হল হাত-পা ধোওয়ার রেওয়াজ। এরপর একদিন বন্ধ করে দেওয়া হল বাড়ির বাথরুমও। নোংরা বাচ্চা-কাচ্চাদের হিসি নাকি বিষাক্ত। সকালে, কিন্ডারগার্টেনে আসা ধনী পরিবারের শিশুদের মধ্যে যদি কোনো সংক্রমণ হয়। ওরা বরং রাস্তার ধারে ওই ছোট বাইরের কাজটা করে আসুক। ফিডার রোডে প্রচুর গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তায় রাতে এভাবে বাচ্চাদের একা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব বুঝে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে আর নয়। অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল। ওই বাড়িতে কাজ করত বছর দশেকের একটি মেয়ে। ক্লাস চলাকালীন রোজ গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে সে চেয়ে থাকত। আমাদের ডাকাডাকিতে একদিন ক্লাসঘরে ঢুকেও এল। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর প্রবল বকুনির ভয়ে আর কোনোদিন সে আসে নি। এরপর আর পারা গেল না। কোথায় ঠাঁই? কোথায় ঠাঁই? যদিচ ঐ গৃহকর্ত্রীর আর্থিক আনুকূল্যেই আনন্দপাঠশালার খরচ অনেকটা উঠত। তাই অন্যত্র গেলে খরচ চালাবই বা কীভাবে, সে বৃত্তান্তও ছিল। তবু, ঠিক হল আরও চাঁদা তোলা হবে। সদস্য বাড়াতে হবে। কিন্তু সমস্যা বাচ্চাদের নিয়ে। যেই শুনল স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, সকলের মনখারাপ।

'অ-দিদিমণি, আমাদের টিপিন দিতে হবে না। আমরা এমনিই রোজ আসব। ইস্কুল বন্ধ ক'র না।'

যেন টিফিন দেবার সমস্যাই প্রবল। তারপরেও স্কুল বন্ধ হল। কিন্তু, এর পরে আয়োজকদের অবস্থা হল আরও পাগল পাগল। পারতপক্ষে রাস্তাঘাটে বাচ্চাদের সামনাসামনিই কেউ হয় না।

দেখা হলেই সবাই ছেঁকে ধরে, 'স্যার কবে থেকে আবার স্কুলে যাব'! স্কুল চলাকালীন সকলকে রোজ স্নান করতে হত। নখ কাটা, চুল কাটা, ধোপ-দুরস্ত দেখা হত। কিন্তু আবার যে কে সেই মূর্তি! ধুলি-ধূসর চেহারার দিকে আর তাকানোও যাচ্ছে না। এলাকাবাসী, স্থানীয় ভদ্রলোকদের বাঁকা মন্তব্যও কমছে না।

'আচ্ছা দাদা ওই ভিখিরিদের স্কুলটা আর চলছে না?'

'ওদের কি আর লেখাপড়া হয়? যত্তসব চোর বদমায়েশ।'

কিছুটা আশার আলো দেখা দিল, এঁড়েদার ঘোষাল বাটীর উদ্যোগে। সে বাড়ির কর্তা অজয় ঘোষালের স্মৃতিতে, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি দু-কামরার বাগান-ঘেরা বাড়ি আমাদের হাতে তুলে দিল। নতুন বাড়ির নাম দিলাম 'আনন্দ কেন্দ্র'। বাড়ির উদ্বোধনে এলেন হোসেনুর রহমান, পূর্ণিকা রহমান, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমলাশঙ্কর, কীর্তন গায়িকা আনন্দী বসু প্রমুখ। ঘোষালবাড়ির পক্ষ থেকে বাচ্চাদের দেওয়া হল বেশ কিছু উপহারও। কিন্তু রথতলা থেকে মাইল দুয়েক দূরত্বে প্রতিদিন যাওয়া শিশুদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা তখন বাড়ি নাকি শিশু এই টানাটানিতে শিশুদের দিকেই রইলাম। এই সময়ই যোগাযোগ হল পুর ইঞ্জিনিয়ার পার্থ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁর পরামর্শ মতোই দরবার করলাম ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধির সঙ্গে। কোনো জায়গা না পেলে আমরা পুরভবনেই কোথাও বাচ্চাদের পড়াতে বসাব। যখন আমাদের এ রকম মরিয়া অবস্থা, তখন পুরপিতা শ্যামল রায় একটা প্রস্তাব দিলেন। জায়গাটা কাছেই। নবনির্মিত ওয়ার্ড অফিস। বি টি রোড লাগোয়া ওয়ার্ড অফিসের কার্যকরী সমিতির অফিস। মিটিং-এর দিন বাদে এবং পোলিও টীকাকরণের মতো কিছু সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সন্ধ্যায় আমাদের স্কুল চালানো যায়। বিশাল হলঘর, জলের ব্যবস্থাসহ দুটো বাথরুম। সামান্য বাগান সমেত আনন্দ পাঠশালার নতুন ভবন আমাদের পরম প্রাপ্তি। উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ জানালাম আরও একটি কারণে। সন্ধান পাওয়া গেল এক মানবিক দোকানদারেরও। রোজ রাতে পড়ার শেষে আমাদের প্রয়োজন মতো তৈরি করে দেবেন গরম গরম হাতে গড়া রুটি-তরকারি। দরকারে ভাত-ডালও।

প্রায় দু'মাস পর ১৯ জুন, ২০১২ সালে সবাই সমবেত হলাম। ঘরভর্তি লোকজনের মাঝে ছোট্ট রাজ কানে কানে বলল, স্যার আমি কখনও ওই রকম ঘরে টালেট করি নি, করতে দেবে? নতুন ঘরে জিৎ, তারককে পাওয়া যায় নি। দু'মাসের যোগাযোগ না থাকায়, ওদের খোঁজই পাওয়া গেল না। কোথায় গেল শিশু দুটি? নতুন উদয় হল মনোজ। বাড়ি ডানকুনি। বাবা ছোট ভাইকে বিক্রি করে দেওয়ায় ভয়ে আর আতঙ্কে সে বাড়িছাড়া। ঘুরতে ঘুরতে রথতলায়। 'আনন্দ পাঠশালা' এখন আবার সরগরম। ঝুলনে রাস্তার ইট বালি, ঘাস-পাতা দিয়ে চমৎকার তৈরি করেছিল পাহাড়ি শহর। গৃহহীন শিশুরাও সুদৃশ্য ভদ্রাসন তৈরি করতে পারে, কী আশ্চর্য! রাখির দিনে হাতে হাতে রাখি। হল একদিন ছবি আঁকা ও মুখোস তৈরির কর্মশালা। ভাইফোঁটায় বাসন্তী, কাজল, সুইটি, সোনিয়া ফোঁটা দিল ছেলেদের। সবাই একদিন সিঁথির মোড়ে ঘুরে এল সার্কাসে। হাতি-ঘোড়া, ট্রাপিজের দমবন্ধ করা খেলা দেখা সত্ত্বেও তাদের ভালো লাগল জোকারের ফিচকেমি।

এর মধ্যে ঘটনারও বিরাম নেই। একদিন রাজ হারিয়ে গেল। শুনলাম একদিন ওর দিদি এসে ওকে নাকি নিয়ে গেছে। কোথায় কেউ জানে না। পরপর দু'দিন রাজকে না দেখে সবাই দিদিমণি হেনাদির বাড়ি এসে জানিয়ে যায়। ওদের সকলেরই ইলোপ হবার ভয়। তাই নিজেরাই নিজেদের খেয়াল রাখে। খবর পেয়ে সকলকে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে যাই। এ ধরনের ভারতবাসী অভিযোগকারী দেখতে অনভ্যস্ত পুলিশ আমাদেরই জেরা শুরু করে। আমরা কে? কোথায় থাকি, মতলবটাই বা কী? ইত্যাদি। ভাগ্যক্রমে তখনই থানায় খবর আসে বিরাটি স্টেশন থেকে একটা ছেলে পাওয়া গেছে। বলছে রথতলায় থাকে। ওই থানা ওকে নিয়ে আসছে। হই-হই করে সকলে দৌড়লাম রাজকে আনতে। পরে শুনলাম ওর দিদি বনগাঁ লাইনের কোথাও কোনো কারখানায় ওকে রেখে দিয়ে আসে। বোঝাই যাচ্ছে, স্বজনের হাতে শিশু ইলোপের ব্যাপার। বিক্রিও করে দিতে পারে। রাজকে সেখানে সারাদিন কাজ করিয়েছে। গ্রিল বন্ধ থাকায় বার হতে পারে নি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ওই কারখানা বাড়ির পাশে নীচে রাজ লাফ দেয়। আগেই ট্রেনের আওয়াজ শুনে বুঝেছিল, পাশে রেললাইন। সেই ধরেই কাছাকাছি স্টেশনে এসে সকাল পর্যন্ত লুকিয়ে ভোরে ট্রেনে চেপে বিরাটি এসে নামে। সেখানেই পুলিশের চোখে পড়ে যায়।

আনন্দপাঠশালা চলছে এ ভাবেই। এখন সবাই কবিতা বলে, বর্ণপরিচয় হয়েছে। গুনতেও পারে। অযাচিত সাহায্য যেমন মিলছে, তেমনি অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ও। প্রয়োজন প্রচুর, কিন্তু ক্ষমতা সীমিত। রাত্রি আবাস চাই। কাজল, সুইটি, সোনিয়া, মমতা, বাসন্তীরা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে উঠছে। যে কোনো অঘটন ঘটার আগে ওদের রক্ষা করা দরকার। ব্যক্তিগত অর্থ আর সামান্য চাঁদায় এ কেমন করে সম্ভব? আপনিও আসুন না একদিন আনন্দপাঠশালায়। বি টি রোডের ব্যারাকপুরগামী যে কোনো বাসে ১১ নম্বর বাস স্ট্যান্ড। বাঁদিকে নওদাপাড়া যাবার রাস্তায় বিহারীলাল ঘোষ রোডে ঢুকেই বাঁদিকে ওয়ার্ড অফিস। রবিবার বাদে রোজ সন্ধ্যেয়। তবে হ্যাঁ, শর্ত হইহই করার অভ্যাস থাকা চাই। শরীরটাও অবশ্য শক্ত হতে হবে। কারণ, রাজ আপনার ঘাড়ে উঠবেই, বাকিদের আবদারও খেলতে হবে।

কি আশ্চর্য, ওরা এখনো আমাদের খেলার যোগ্য মনে করে!!

উমা

আবহাওয়া চেনার সহজপাঠ

বিবেক সেন

পূর্বপ্রকাশিতের পর

বর্ষাঋতু (জুন - সেপ্টেম্বর)

আপনার কল্পনাকে আরও একটু প্রসারিত করুন। ধরুন সময়টা বর্ষাকাল। এই ঋতুতে রাজস্থান থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা বরাবর পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত নিম্নচাপের একটা দ্রোণী প্রসারিত থাকে। আবহাওয়াবিদ একে monsoon trough (মৌসুমী -দ্রোণী) বলে থাকেন। তবে এই বিন্যাস একটি অস্থায়ী গড় অবস্থান (semi-permanent)। কারণ দ্রোণীটি কখনও কখনও উত্তরে সরে গিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কখনও বা দক্ষিণে সরে আসে ও পূর্বপ্রান্তটি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গড় অবস্থানে এই দ্রোণীর দক্ষিণে উপরে দেওয়া সূত্র অনুযায়ী বায়ুর গতিমুখ হওয়া উচিত দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে আর উত্তরে এর ঠিক উল্টো। যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে না এসে পূব দিক থেকে আসছে, হচ্ছে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, তবে সম্ভবত বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। যদি এই পূবালী হাওয়ার বেগ ক্রমে বাড়তে থাকে, সঙ্গে দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টিপাত, তবে নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে এমন সিদ্ধান্ত হয়ত ভুল হবে না।

অন্য একটা পরিস্থিতিতে দেখলে হাওয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বা মোটামুটি পশ্চিম দিক থেকে, হাওয়ার বেগটাও গেছে বেড়ে, বৃষ্টি নেই অথবা ছিঁটেফোঁটা, অসহ্য ভ্যাপসা গরম। সংবাদপত্রে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ, বিহার বা উত্তর প্রদেশ থেকে বন্যার খবর। তাহলে ধরে নিতে পারেন monsoon trough সরে গেছে হিমালয়ের পাদদেশে।

বর্ষাকালে মৌসুমী-দ্রোণীর এই দোলাচল উত্তর ও দক্ষিণে বৃষ্টিপাতকে ছড়িয়ে দেয় —কখনও উত্তরে কখনও বা দক্ষিণে। বর্ষার মেঘকে সমুদ্র থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বহন করার কাজটি প্রধানত সম্পন্ন হয় মৌসুমী-দ্রোণীর দক্ষিণ প্রান্তে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের সাহায্যে। জুলাই-আগস্ট মাসে নিম্নচাপটি সৃষ্টি হয়ে থাকে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে —উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল জুড়ে। এটি সাধারণত খুব গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আগেই মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৃষ্টিপাতই এদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আগস্টের শেষ দিকে ও সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নচাপগুলি তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল থেকে আরও দক্ষিণে। তাই মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার আগে সমুদ্রের উপর বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হয়। ফলে জলীয় বাষ্পের জোগান বজায় থাকায় এটি গভীর নিম্নচাপ ও কখনও কখনও সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়।

আলোচিত নিম্নচাপগুলি পূর্ব ভারতের দিকে যায় না বটে, তা সত্ত্বেও নিম্নচাপের পূর্ব দিকে প্রবাহিত দক্ষিণা বাতাস এই অঞ্চলে অর্থাৎ আসাম, মনিপুর মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

বর্ষা যেমন শস্যের ভাল ফলনের জন্য জরুরি, অন্য দিকে একাধিক দিনে ক্রমাগত অত্যধিক বর্ষণ দুর্ভোগের কারণ হয়ে থাকে। এতে শস্যের যেমন ক্ষতি হয় তেমনি পথ-ঘাট ও বাড়ি-ঘর জলমগ্ন হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রয়োজন হয় দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার করার কাজ। এমন পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য সরকার আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সর্বদা সমন্বয় রেখে চলেন ও ভারী বর্ষণের আগাম পূর্বাভাস পেলে ত্রাণকার্যের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে যদি কোনও গভীর নিম্নচাপ উড়িষ্যার উত্তর উপকূল দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তাহলে তার গতিপথ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে উত্তর ও পরিশেষে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে শুরু করে। এই গতিমুখ পরিবর্তনের সময় নিম্নচাপটির চলার বেগ কমে। কাজেই প্রায় একই জায়গায় কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় বন্যার সৃষ্টি হয় —প্রথমে দক্ষিণবঙ্গে ও তারপর উত্তরবঙ্গে। শারদীয়া সার্বজনীন পূজা সংগঠকদের কাছে মনে হয় এটি একটি প্রয়োজনীয় তথ্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য এক সতর্কবাণী। অবশ্য প্রতি বছরই এরকম নিম্নচাপ হয় না, তবে এই সময়ে উপরোক্ত স্থানে নিম্নচাপ দেখা দিলে সতর্ক থাকা লাভজনক হবে মনে হয়।

শরৎকাল (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল ঝলমলে আকাশ যেন আসন্ন দুর্গোৎসবের জন্য সাজানো প্রেক্ষাপট। দুর্গোৎসব বাঙালির সর্ববৃহৎ আনন্দযজ্ঞ। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কদাচিৎ ভাগ্যে জোটে। শরতের ঝলমলে আকাশও কখনও কখনও হয়ে ওঠে মেঘাচ্ছন্ন। পৃথিবীতে নামে বিষণ্ণতা। কারণ এই ঋতুতেই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়ে থাকে প্রলয়ঙ্করী সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোন জন্মানোর অনুকূল পরিবেশ।

বর্ষাকালে নিম্নচাপ সৃষ্ট হয়ে থাকে উপসাগরটির

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। কিন্তু সূর্যের দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নচাপ সৃষ্টির অঞ্চল সরতে থাকে উপসাগরের আরও দক্ষিণে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপসাগরের নিম্নচাপগুলি সৃষ্টি হয় উপসাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে। গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর এটি প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মূল ভূখণ্ডে পৌঁছাবার আগে এদের অনেকটা পথ সমুদ্রের ওপর কাটে। তাই সমুদ্রের জোগান দেওয়া জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের শক্তির সাহায্যে গভীর নিম্নচাপটির সাইক্লোনে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর গভীর নিম্নচাপ বা সাইক্লোনটি আরও একটু উত্তর ঘেঁসে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ও অন্ধ্র বা দক্ষিণ উড়িষ্যার উপকূলে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কোনও সাইক্লোন সৃষ্ট হয়ে থাকলে তার গতিপথ আরও ডানদিকে বেঁকে অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূল ছুঁয়ে পশ্চিমবঙ্গ বা কখনও কখনও বাংলাদেশের উপকূলে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে।

আম জনতাকে সাইক্লোনের এই বিচিত্র গতিপথের হদিশ জানানোর কারণটা হল আবহাওয়াবিদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে —যে সাইক্লোনটি অন্ধ্র উপকূলে আঘাত করার কথা দেখা যায় সেটি মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করল উড়িষ্যা বা পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে। সাইক্লোন তার খেয়াল-খুশি মতো গতিপথ বদলায় না। সেটা নির্ভর করে সাইক্লোনটির উপরে ১২/১৩ কি মি উপর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ুপ্রবাহের উপর। কোনও সাধারণ সহজ সূত্র না থাকলেও আবহাওয়াবিদ গতিপথের এই পরিবর্তনের কথা আন্দাজ করতে পারেন। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় এই পরিবর্তন শুরু হবে সেটা বোঝার জন্য তাকে সদা সতর্ক নজর রাখতে হয়। যখন আবহাওয়াবিদ জানান যে সাইক্লোনটির চলার বেগ খুব কমে গেছে বা প্রায় একই স্থানে অবস্থান করছে তখন আশা করা যায় যে খুব সম্ভবত এবার তার গতিপথ পরিবর্তিত হতে চলেছে। 'খুব সম্ভবত' কথাটা বলার উদ্দেশ্য খুব কম হলেও এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা গেছে। সেই জন্য উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির অধিবাসীদের ও সরকারকে সতর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা মনে রেখে পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ব্যাপারে কিছুটা সমঝোতা করে চলতে হয়। বছর যত গড়িয়ে চলে সাইক্লোনের আতুরঘর ততই দক্ষিণে সরতে থাকে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। নভেম্বরের শেষ নাগাদ ও ডিসেম্বর মাসে সাইক্লোন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থাকে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে। যদি কোনও নিম্নচাপের আবির্ভাব হয় ১৫° অক্ষাংশেরও দক্ষিণে তবে যার যাত্রাপথ হবে পূব থেকে পশ্চিম দিকে। উত্তরে না বেঁকে এটি শক্তিশালী হওয়ার পর দক্ষিণ অন্ধ্র বা তামিলনাড়ু উপকূলে আঘাত করে। মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পরও এটির পশ্চিমমুখী গতি অব্যাহত থাকে। ক্রমে শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হয়ে যদি অন্তত নিম্নচাপরূপেও আরবসাগরে পড়তে পারে তবে এটি আবার শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাত্রাপথ হয় উত্তর-পশ্চিম বা উত্তরমুখী। কখনও কখনও এই ধরনের গভীর নিম্নচাপ বা সাইক্লোন উত্তর-পূর্ব দিকে বেঁকে গুজরাট উপকূলে পৌঁছে যায়। নভেম্বরের পর কোনও সাইক্লোনের পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আঘাত করার সম্ভাবনা থাকে থাকে না বলা যেতে পারে।

শীতের মরসুমে বৃষ্টি (জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি)

শীতের দুটো মাস পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে আরামদায়ক —বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গে। দিনের বেলায় নরম রোদ, রাতে কোমল ঠাণ্ডা। উত্তরবঙ্গে রাতে শীতের কামড় হাড় কাঁপায় বটে, কিন্তু দিনের রোদ্দুর আরামদায়ক। বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে প্রায় উধাও, উত্তরবঙ্গে অনিয়মিত আগন্তুক।

একটু হয়তো অতিরঞ্জন হয়ে গেল। দক্ষিণ বঙ্গে বৃষ্টি উধাও বলা হয়েছে বটে, তবে কোনও কোনও বছরে এদিকেও বৃষ্টি হয়ে থাকে; উত্তরবঙ্গে শীতকালে এর আনাগোনা একাধিক বার। যাই হোক, আমাদের উদ্দেশ্য অসময়ে এই হঠাৎ বৃষ্টির আগাম হদিসের তল্লাশি। বৃষ্টির বাহক নিম্নচাপ। (ব্যতিক্রম গ্রীষ্মের কালবৈশাখী)। শীতের মরসুমে এই নিম্নচাপের হদিস পেতে হলে জানা দরকার এদের হালচাল।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে অর্থাৎ বিষুবরেখা ও ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপগুলির চলার পথ পূব থেকে পশ্চিম দিকে —একটু উত্তর ঘেঁসে। ভারতের অধিকাংশেরই অবস্থান এই অঞ্চলে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অর্থাৎ ৩০° থেকে ৬০° অক্ষাংশের মধ্যে নিম্নচাপগুলির (extra-tropical cyclone) চলার পথ পশ্চিম থেকে পূব দিকে —একটু উত্তর ঘেঁসে। আমাদের বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে এই নিম্নচাপগুলি ভারতের অনেকটা উত্তর দিয়ে চলে যায় —ভারতে কোনও বৃষ্টিপাত ঘটায় না। চলার পথে এই নিম্নচাপগুলি দক্ষিণে নতুন নতুন নিম্নচাপ সৃষ্টি করে থাকে। ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণে সৃষ্ট এই নতুন নিম্নচাপ পাকিস্তান ও পরে ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বৃষ্টি দেয়। হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে হয় তুষারপাত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এরা সৃষ্ট হয় আরও দক্ষিণে। যাত্রাপথে পড়ে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ। নেপাল অতিক্রম করে সিকিম, দার্জিলিং ও ভূটানে পৌঁছায় আরও দু-তিন দিন পরে। তারও পরে বৃষ্টি হয় আসাম ও অরুণাচল প্রদেশে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যাত্রাপথে পড়ে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলি। গতিপথ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হওয়ার দরুণ এদের 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' (western disturbances) নাম দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার চালচলনের এই বর্ণনা দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য —এদের আগমনবার্তার আগাম হদিসের সন্ধান করা।

সূত্র কিন্তু একটাই। নজর রাখুন 'হাওয়া কোন দিকে'। পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছানোর আগে এর অবস্থান হবে বিহার বা ঝাড়খণ্ডে। হাওয়ার গতি হওয়া উচিত দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে বা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। শীতকালে হাওয়া আসে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম থেকে। কিন্তু পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হঠাৎ ঘুরিয়ে করে দিল দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ থেকে। এই পরিবর্তন নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। আবার দেখুন পশ্চিবঙ্গের উপর দক্ষিণা হাওয়া মানে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে বয়ে আসা জলীয় বাষ্পে ভরা উষ্ণ বায়ু। ফলে মনে হবে এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল শীতের আয়ু? প্রকৃতির একি পাগলামি! নাকি, আবহাওয়াটা সত্যিই বদলে যাচ্ছে! পরদিন হয়ত আবহাওয়াবিদের আশ্বাসবাণী পাবেন —আশঙ্কার কারণ নেই, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই আবহাওয়ার এই সাময়িক পরিবর্তন; দু-তিন দিনের মধ্যেই উত্তরের হিমেল হাওয়া আবার ফিরে আসবে।

এই দু-তিন দিনের আবহাওয়াটা কেমন হবে? সেটা বুঝতে হলে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার গঠনটা জেনে নেওয়া দরকার। কারণ বর্ষাকালের নিম্নচাপ বা সাইক্লোনের গঠন থেকে এটা অনেকটাই আলাদা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার তিনটি ভিন্ন চরিত্রের অঞ্চল আছে। মধ্যবর্তী অঞ্চলের বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ ও উষ্ণ, কাজেই তুলনামূলক ভাবে হাল্কা। পূব দিকের অঞ্চলটি শীতল ও শুষ্ক বায়ু, তাই তুলনায় ভারী। পশ্চিম অঞ্চলের বায়ু মেরু অঞ্চল থেকে আসা খুবই শীতল ও পূব অঞ্চলের বায়ুর চেয়েও ভারী। চলার পথে এক একটা অঞ্চল আর একটার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে নানা রকমের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এড়িয়ে শুধু আবহাওয়ার চরিত্রের কেমন রকমারি পরিবর্তন হয় সেটাই এখন বর্ণনা করা যাক।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রথের নিশান হল আকাশে অনেক উঁচুতে মোটামুটি ২০,০০০ ফুট বা তার বেশি উচ্চতায় গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমী চুলের মতো মেঘ। রথটি আছে দিন দুয়েক দূরে। রথ যত এগোতে থাকে আকাশ যেন একটা রেশমি চাদরের মতো মেঘের আড়ালে ক্রমেই ঢাকা পড়তে থাকে। আকাশ ঢাকা পড়লেও সূর্য বা চাঁদকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। দু-এক দিনের মধ্যেই মেঘ নেমে আসে ১৫,০০০ ফুট বা তারও কম উচ্চতায়। ঘন মেঘের আড়ালে সূর্য ও চাঁদকে মনে হয় যেন ঘষা কাঁচে ঢাকা। ক্রমে শুরু হয় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। ততক্ষণে ঝঞ্ঝার মাঝের অঞ্চলটি পৌঁছে গেছে। বাতাস বেশ গরম। আকাশ একটু একটু করে মেঘমুক্ত হচ্ছে। বৃষ্টি গেছে বন্ধ হয়ে। মনে হতে পারে পশ্চিমের ঝঞ্ঝা এবারের মতো বুঝি আমাদের এলাকা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে পূবের দেশে। কিন্তু সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে ১০-১২ ঘণ্টার মধ্যে আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করে দেয়। এবার আর হাল্কা বৃষ্টি নয়। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টি বন্ধ হতেই আকাশ হয় প্রায় মেঘমুক্ত। সেই সঙ্গে শুরু হয় কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। জানিয়ে দেয় ঝঞ্ঝার তৃতীয় অঞ্চলটি এবার হানা দিয়েছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই দেখা দেয় ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। শীত আবার জমিয়ে বসে।

পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার আর একটি বিশেষত্ব এরা সঙ্গে নিয়ে আসে ঘন কুয়াশা —একবার এটি প্রথম অঞ্চলের সম্মুখে, আবার তৃতীয় অঞ্চলটির পশ্চাতে। অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের রকমটা হবে —ঘন কুয়াশা, হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, গরম হাওয়া কিন্তু বৃষ্টি নেই বা অনেকটাই কম, তারপরে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, সবশেষে আরও ঘন কুয়াশা। শীতের সকালে প্রায় রোজই একটা হাল্কা কুয়াশা দেখা যায় যেটা সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দুয়েক পরেই মিলিয়ে যায়। পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার সঙ্গী কুয়াশা হয় ঘন ও অনেক বেশিক্ষণ স্থায়ী। এই পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার এই বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে পাওয়া যায় ৩০° অক্ষাংশের উত্তর দিকের অঞ্চলে —নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে। এর দক্ষিণে নতুন যে নিম্নচাপগুলি সৃষ্ট হয় তাতে ঝঞ্ঝার অঞ্চল তিনটির পৃথক সত্তা প্রায়ই লুপ্ত হয়ে যায়। সেটা কিছুটা বজায় থাকে বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে। তাহলেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ধরনটা উপরে বলা বর্ণনার সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। মূল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে অঞ্চল তিনটির পার্থক্য কিছুটা ধরা পড়ে। আর ফেব্রুয়ারিতে এরকম হলে বজ্র-বিদ্যুতের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পিছনে ধাওয়া করা মেরু অঞ্চল থেকে আসা হিম-শীতল হাওয়া কখনও কখনও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও ৬-৭° সে. নীচে নামিয়ে দেয়। এরকম আবহাওয়াকে শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতেই এর প্রকোপ খুব বেশি হয়ে থাকে। মৃত্যুর সংখ্যাও নগণ্য নয়।

গ্রীষ্মকাল (মার্চ - মে)

গ্রীষ্মকালেও পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার আনাগোনা চালু থাকে। বরং এই নিম্নচাপগুলি আরও কিছুটা দক্ষিণে সৃষ্টি হয় বলে গুজরাত থেকে শুরু করে পূব দিকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম পর্যন্ত এর পদচিহ্ন রেখে যায়। এদের আগমনের পূর্বাভাসের সঙ্কেত আগেই বলা হয়েছে। বর্ষার শুরুতে এদের গতিপথ সীমাবদ্ধ থাকে হিমালয়ের উত্তরে। ভারতবর্ষে থাকে বর্ষার দাপট।

গ্রীষ্মকালের তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গে দৌরাত্ম্য থাকে প্রধানত কালবৈশাখীর, আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে আঁধির। দুঃখের বিষয় শুধু হাওয়ার গতি দেখে কালবৈশাখীর আগাম আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলের ত্রিমাত্রিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ। একমাত্র আবহাওয়াবিদের পক্ষেই সম্ভব

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা। পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার নিম্নচাপ সামান্য সংখ্যক কালবৈশাখীর উৎপত্তির কারণ হয় বটে, তবে সাধারণ ভাবে কালবৈশাখীর উৎপত্তির জন্য কোনও নিম্নচাপ থাকা জরুরি নয়। প্রয়োজন প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের এক বিস্ফোরক অবস্থা, যেখানে আছে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সন্দেহজনক বিস্ফোরকের সঠিক চরিত্র বোঝার জন্য যেমন বম্ব-স্কোয়াডের ডাক পড়ে, তেমনি বায়ুমণ্ডলের এই অদৃশ্য বিস্ফোরক অবস্থার তদন্তে প্রয়োজন হয় আবহাওয়া বিশেষজ্ঞের।

আবহাওয়াবিদের পক্ষ নিয়ে এই সওয়াল করা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে। কারণ বর্তমান যুগের মতো উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা যখন ছিল না তখন যাত্রীদের মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হত নদী পথে। তাদের মনে থাকতে পারে মাঝিদের আগাম সতর্কবার্তা —'কর্তা, ঝড় আসার সম্ভাবনা। এবার নৌকা ভিড়াতে হবে'। তাদের কাছে কোনও তথ্যাদি থাকত না, সম্বল ছিল শুধু আকাশ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা ও পূর্বের অভিজ্ঞতা। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে গগনচুম্বী মেঘকে চিনে নিতে তাদের ভুল হত না। আন্দাজ করে নিতে পারত কত ঘণ্টা পরে ঝড়টি তাদের গ্রাস করে নিতে পারে। সেই সময়ের মধ্যে তাকে খুঁজে নিতে হত নিরাপদ আশ্রয়।

চেষ্টা থাকলে মাঝিদের এই পর্যবেক্ষণ দক্ষতা সকলেরই আয়ত্তে আসতে পারে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে কোনও মেঘ জমছে কিনা। স্মরণ করুন রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতার প্রথম পংক্তিটি —'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা'। নৌকার মাঝির মতো আকাশে চোখ রাখুন। তারপর আপনিও বলতে পারবেন গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে এবার মুক্তি পাবেন কিনা। তবে একটু খামতি থেকেই যায়। ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিলে তবেই আপনি আন্দাজ করতে পারছেন কালবৈশাখীর শীতল হাওয়া পাচ্ছেন কিনা। কিন্তু আবহাওয়াবিদকে এর আগাম আভাস দিতে হয় কালবৈশাখীর মেঘ সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে —যখন আকাশে এক কণা মেঘও দেখা দেয় নি। যাই হোক, আবহাওয়াবিদের অপেক্ষায় না থেকে নৌকার মাঝি বা আপনি কি করে বুঝবেন মেঘ দেখা গেলেও কালবৈশাখীর কৃপা আপনি পাবেন কিনা? সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারবেন যদি মেঘটি উত্তর-পশ্চিম কোণে বা অন্তত পশ্চিম দিকে দেখা যায়। কারণ কালবৈশাখীর মেঘ ধেয়ে আসে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বা কখনও কখনও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। যদি মেঘটিকে উত্তরে বা দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা যায় তবে ধরে রাখতে পারেন এটি আপনাকে এড়িয়ে যথাক্রমে আপনার পূব বা দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে যাবে।

আবহাওয়ার টুকিটাকি

আবহাওয়ার আগাম আভাসের যে টুকিটাকি সঙ্কেতগুলো পাওয়া গেল আসুন এবার সেগুলো আমাদের ঝুলিতে সংগ্রহ করে রাখি। ঋতু অনুযায়ী এগুলো প্রয়োগ করে আবহাওয়াবিদের পূর্বাভাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কতটা সফল হওয়া যায় পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? যদি ব্যর্থ হন তবে হতাশ হবেন না। পর্যবেক্ষণে কি ধরনের খামতি হতে পারে সেটা ভাবুন ও সেটাকে সংশোধন করুন। জানেনই তো ব্যবহারে অস্ত্র ধারালো হয়। কাজেই এবার আসুন ঝুলিটা খুলে টুকিটাকিগুলো এক এক করে তুলে রাখা যাক।

(১) খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বায়ুর গতিপথের দিক নির্ণয় করুন। (২) উপরে বলা সূত্র অনুযায়ী নিম্নচাপ কোন দিকে অবস্থান করছে সেটা বুঝে নিন। (৩) আবহাওয়াবিদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিম্নচাপটি কতটা শক্তিশালী (নিম্নচাপ, সুস্পষ্ট নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ বা সাইক্লোন) জেনে নিয়ে বাতাসের জোর কিরকম হতে পারে উপরে দেওয়া তালিকা থেকে সেটা দেখে নিন। (৪) বাতাস কত জোরে বইছে সেটা দেখে নিম্নচাপটি কাছে কি দূরে আন্দাজ করে তালিকা থেকে সেটা দেখে নিন। (৫) ঋতু অনুযায়ী নিম্নচাপটির গতিপথ উপরে দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী কোন দিকে হতে পারে সেটা দেখে নিন। (৬) বাতাসের গতিপথের উপর নজর রেখে ও উপরে দেওয়া সূত্র প্রয়োগ করে জেনে নিন নিম্নচাপটি আপনার অবস্থানের অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ পেরিয়ে গেছে কিনা। যদি পেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে নিম্নচাপটি আপনার অবস্থান থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবে। (৭) একই নিয়মে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অবস্থান বুঝে নিন। (৮) পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার আবহাওয়া বৈচিত্র্য মাথায় রাখুন। ঘন কুয়াশাকে অবহেলা করবেন না। (৯) শক্তিশালী পশ্চিমী-ঝঞ্ঝার তৃতীয় অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রাখবেন। এরপর সম্ভাব্য শৈত্যপ্রবাহের জন্য প্রস্তুত থাকুন। (১০) মনে রাখবেন গ্রীষ্মে কালবৈশাখীর মেঘ উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিগন্তে দেখা গেলে তবেই তার সুফল ও কুফল আপনি অনুভব করতে পারবেন।

সঙ্কেতগুলো সব মাথায় রাখতে হবে এমন ভাববেন না। ঋতু ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটা বা দুটো সঙ্কেত হয়ত আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে। ঝুলি থেকে বের করে সেটা দেখে নিলেই কাজ চলে যাবে। যদি প্রয়োগ করার অভ্যাস করেন আপনিই সেটা মাথায় বসে যাবে। বাড়িতে বসে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের শিক্ষানবিশী করাটা মন্দ কি! কখনও সখনও যদি সফলতা মেলে তার আনন্দটা আপনার উপরি পাওনা।

উ মা

বছরে পাচার হচ্ছে ১০০ কোটির সাপের বিষ

জামিউল আহসান সিপু

দেশি ও বিদেশি আন্তর্জাতিক চক্র প্রতি বছর প্রায় একশ কোটি টাকার কোবরা (গোখরা) সাপের বিষ পাচার করছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সাপের বিষ পাচার হয়। গত সোমবার রাজধানীর উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরের লেক থেকে ১২ আউন্স সাপের বিষ উদ্ধার করার পর পুলিশ এই সাপের বিষ পাচারকারী চক্রকে খুঁজছে। এর আগে গত তিন বছরে রাজধানীতে এ ধরনের বেশ কয়েকটি সাপের বিষ পাচার চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি খন্দকার রেজাউল হাসান বলেন, কোবরা সাপের বিষের বিদেশে ব্যাপক চাহিদা আছে। দেশের কতিপয় অসাধু চক্র কোবরা সাপের বিষ সংগ্রহ করে কোটি কোটি টাকায় বিদেশি চক্রের কাছে পাচার করছে। এক আউন্স সাপের বিষের দাম ১ কোটি টাকা। বিদেশি চক্র বাংলাদেশ থেকে সাপের বিষ কেনার জন্য তাদের কয়েকটি চক্র সক্রিয় রেখেছে। দেশে তাদের কয়েকটি এজেন্টও রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের আগস্টে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি আবাসিক হোটেল থেকে ১২ আউন্স সাপের বিষ উদ্ধার করে। ২০১০ সালে মতিঝিল থেকে ২ আউন্স সাপের বিষ উদ্ধার করে। এসব সাপের বিষ ফ্রান্স থেকে আনা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পাচারকারী চক্রের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করা সাপের বিষের বোতলের গায়ে 'মেইড ইন ফ্রান্স' লেখা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের ডঃ সীতেশচন্দ্র বাছার বলেন, কোবরা সাপের বিষ থেকে সাপ কামড়ানোর চিকিৎসার জন্য প্রতিষেধক তৈরি হয়। এ ছাড়া ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ওষুধ তৈরিতে কোবরা সাপের বিষ একটি মূল্যবান উপাদান। বাংলাদেশে কোনও ওষুধ শিল্পে সাপের বিষ ব্যবহার না হলেও উন্নত বিশ্বের গবেষণাগারে পটাসিয়াম সায়ানাইডের টক্সিন তৈরিতে এই সাপের বিষ ব্যবহার হয়। এ কারণে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া যেসব দেশ রাসায়নিক মৌল বা যৌগ উপাদান তৈরি করে তাদের কাছে কোবরা সাপের বিষ খুবই মূল্যবান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন বিশিষ্ট প্রাণী বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ আবুল বাশার জানান, কোবরা (গোখরা) বিশ্বে সবচেয়ে বিষধর সাপ। বাংলাদেশে কোবরা সাপের সেভাবে কোনও খামার গড়ে ওঠে নি। সাপুড়ে বা অন্য কোনও চক্রের মাধ্যমে একটি চক্র কোবরা সাপের বিষ সংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করছে। এ সাপের বিষ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে সরকার বছরে কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। এই সাপের বিষ উৎপাদন করতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা সেল, প্রশাসনিক সেল ও ইকোলজিক্যাল সেল গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রসায়নবিদ জানান, রসায়ন গবেষণাগারে সাপের বিষ একটি মূল্যবান উপাদান। কোবরা সাপের বিষ অনেক রোগের প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণাগারে বিক্রিয়ায় প্রভাবক ও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। কোবরা সাপের বিষ বিশ্বে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবক ও অনুঘটক তৈরিতে ব্যবহার হয়। এ কারণে উন্নত বিশ্বে যেসব দেশ রাসায়নিক উপাদান তৈরি করে ঐসব দেশে কোবরা সাপের বিষ মূল্যবান। এ ছাড়া কোবরা সাপের বিষ দিয়ে বায়োকেমিক্যাল (বায়ু জীবাণুমুক্ত অস্ত্র) অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে। এ কারণে কোবরা সাপের বিষের উন্নত বিশ্বে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

(২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

অভিনব বিবাহ-অনুষ্ঠান

প্রতিবেদন : বিয়ের অনুষ্ঠান, তবে আর পাঁচটা বিয়ের অনুষ্ঠানের চেয়ে একেবারেই আলাদা। এক কথায় বলা চলে অভিনব। না, টোপর, পুরোহিত, যদিদং হৃদয়ং, সাত পাকে ঘোরা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। একেবারে কাগজে-কলমে বিয়ে। কিন্তু সেটাও অন্য রেজিস্ট্রি বিয়ের চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের। নদীয়ার বড় জাগুলির নিরঞ্জন বিশ্বাসের মেয়ে পলির (পারমিতা) সঙ্গে উৎপলের বিয়ে ঠিক হয়। উৎপলের বাড়ি থেকে নিরঞ্জনবাবুর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই একটা দিন ঠিক করার। নিরঞ্জনবাবু দিন হিসাবে বেছে নেন ১৪ তারিখকে (ইংরেজির ৩০ নভেম্বর ২০১২)। তার কারণ ওই দিনটি বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিনও বটে। বিয়ের দিনটি শুধু দম্পতির কাছেই নয়, আত্মীয়-পরিজনদের কাছেও স্মরণীয়। এমন দিন বেছে নিলে তা সবার মনে গাঁথা হয়ে যাবে, এমন ভাবনা তো ছিলই। সেই সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু এতে আরও এক মাত্রা যোগ করেন। আর উৎপলের বাড়ির লোকেরা তা সাগ্রহে মেনেও নেন। সেই মতো প্রথমে উৎপল ও পারমিতা জগদীশচন্দ্রের ছবিতে মাল্যদান করেন, তারপর সবার সামনে বিবাহ নথিভুক্তকরণের কাগজপত্রে সইসাবুদ হয়। পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠানে মনীষীদের প্রতীকী উপস্থিতির প্রতিভূ হিসাবে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনাও। অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের অভিভূত করেছে। সেই কারণেই এটি পত্রিকার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হল।

উমা

এক প্রকৃত শিক্ষক

দীপঙ্কর চৌধুরি

কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের স্পর্শ আমাদের জীবনে এক অনপনেয় দাগ রেখে যায়। কিন্তু যখন অসাধারণ কোনো ব্যক্তি তাঁর আপাত সাধারণ কথা আর কাজের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেন, তখন প্রকৃত অর্থেই তিনি আমাদের মনে গভীর ছাপ রেখে যান। এমনই এক মানুষ ছিলেন অধ্যাপক অনাদিশঙ্কর গুপ্ত। খড়গপুর আই আই টি থেকে ডি এসসি প্রাপ্ত অধ্যাপক গুপ্ত জীবনে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল 'ফ্লুইড ডিনামিকস্ ও ম্যাগনেটো-হাইড্রোডিনামিকস্-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের' স্বীকৃতি হিসেবে শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর পুরস্কার, যা তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে।

হৃদযন্ত্র-জনিত সমস্যা নিয়ে ২০১২ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত অনাদিশঙ্কর ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক নীলরতন ধর এবং অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের উত্তরাধিকারের প্রকৃত ধারক ও রক্ষক। তিনি ছিলেন এঁদের নীরব ছাত্র। পূর্বসূরীদের শিক্ষা নিজের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণের মাধ্যমে তিনি তাঁদের যথার্থ সম্মান দেখিয়েছিলেন। শিক্ষক ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সরাসরি তাঁর অধীনে গবেষণারত ছাত্রদের তো বটেই, তাঁর বিভাগে প্রতিটি ছাত্রকেই তিনি সাহায্য করতেন। এই সহায়তা গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জি আহরণে অথবা গবেষণাপত্র রচনার ক্ষেত্রেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকত না। বহু সময় অধ্যাপক গুপ্ত আর্থিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তা দিয়ে তাঁর ছাত্রদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ও পড়াশুনা চালাতে সাহায্য করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও খড়্গপুর আই আই টি-তে অধ্যয়ন শেষ করে শিক্ষক হিসেবে খড়্গপুর আই আই টি-তে যোগ দেবার প্রথম দিন থেকেই তিনি এই কাজে ব্রতী হন। আই আই টি তো বটেই, আই আই টি-র বাইরেও শত শত ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের কঠিন সময়ে অধ্যাপক গুপ্তকে তাদের পাশে পেয়েছিল।

তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রী ব্যাঙ্গালোরে তিন-চার বছর ধরে পি এইচ ডি-র জন্য গবেষণা চালাচ্ছিল। ছাত্রীটির গবেষণা খতিয়ে দেখার জন্য যে পরিষদ গঠিত হল, অধ্যাপক গুপ্ত তার সদস্য হিসেবে আমন্ত্রিত হলেন। গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনা কয়েক মিনিট গড়ানোর পরই অধ্যাপক গুপ্ত উপলব্ধি করলেন যে ছাত্রীটি গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে গেছে। তিনি আরো বুঝলেন যে এর জন্য ছাত্রীটির কোনো দোষ নেই, এই লক্ষ্যভ্রষ্টতার কারণ হল তাকে সঠিক রাস্তাটি দেখানো হয় নি। ছাত্রীটির বক্তব্যের মাঝখানেই তিনি তাকে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন যা থেকে একটি বিকল্পের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। পরিশেষে তিনি ছাত্রীটির কাছে গিয়ে আরো কিছু বিকল্পের উদাহরণ দিলেন যা তার গবেষণা সম্পন্ন করার কাজকে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে। ছাত্রীটি যথাসময়ে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছিল।

ওই পরিষদের এক সদস্য দীর্ঘদিন প্রথমে ছাত্র ও পরে সহকর্মী হিসেবে অধ্যাপক গুপ্তকে চিনতেন। তিনি প্রচলিত রীতির বাইরে যাবার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে অধ্যাপক গুপ্ত স্মিত হেসেছিলেন। সদস্যটি জোরাজুরি করলে তিনি বলেছিলেন, যেহেতু ছাত্রীটির কোনো দোষ ছিল না, তাই তার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা যাতে বিফলে না যায়, শিক্ষক হিসেবে তা দেখার নৈতিক দায়িত্ব তাঁরই। সঠিক কাজ করার জন্য তাঁর এই স্বতস্ফূর্ততা গবেষক ও বিদ্বজ্জন মহলে তাঁকে অন্য অনেকের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল।

জীবনে তিনি বহু সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত গুণের অধিকারী রূপেই তিনি সর্বাধিক উজ্জ্বল হয়ে রইবেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত হারিয়েছে এমন এক প্রবীড় বিজ্ঞানকে যিনি প্রায় চার দশক ধরে গণিতশাস্ত্রে অন্যতম এক আলোর দিশারী রূপে গণ্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সত্তরোর্ধ এই মানুষটির প্রয়াণে আমরা হারালাম সেই শাশ্বত অপ্তবাক্যটির মূর্ত সত্ত্বাকে —'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'।

ভাষান্তর : পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্র : NOW & AGAIN /The Statesman September 2012

বাণিজ্যিক নয় মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর : ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

পাখি নিয়ে একদিন

পক্ষিবিজ্ঞানী ডঃ সত্যচরণ লাহা (১২৫ বর্ষ, ১৮৮৮-১৯৮৪) ও পক্ষিবিদ-সুলেখক অজয় হোম (১০০ বর্ষ, ১৯১৩-১৯৯২) স্মরণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'পশ্চিমবঙ্গে পক্ষীচর্চা/পাখি সংরক্ষণ/পাখি পালন/পাখি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক ভাবনাচিন্তা।' গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের ৪র্থ বর্ষ বিজ্ঞান আলোচনা-আড্ডায় (সিডি শো সহ) প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা বক্তব্যে আহ্বায়ক দীপক কুমার দাঁ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী ও পরিযায়ী মিলিয়ে ৮৫০ প্রজাতির বেশি পাখি দেখা যায়। ভারতের প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় প্রায় ৭০ শতাংশ। বর্তমানের বাস্তুতন্ত্রের নানা সংকট ও পরিস্থিতির মধ্যে এইসব পক্ষীকুল কেমন আছে, তার বিষয়ে সরিজমিনে তথ্য সংগ্রহ ও নথিভুক্তকরণ জরুরি। বর্তমানে অনেক তরুণ প্রকৃতিপ্রেমী পাখি দেখার/চেনার নেশায় ক্যামেরা নিয়ে বনজঙ্গল-নদীনালার পাড়ে ওত পেতে রয়েছেন। এঁদেরকে পশ্চিমবঙ্গে পক্ষীচর্চায় একত্রিত করতে পারলে বড়ো কাজ গড়ে তোলা যেতে পারে।

অজয় হোম

যাঁরা খাঁচায় পাখি পোষেন (বার্ড ব্রিডার বা কেজ বার্ড) তাঁদের রয়েছে গভীর সমস্যা। বর্তমানের বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী খাঁচায় কোনও ভারতীয় পাখি পোষা যাবে না। এজন্য কিছু পাখিপাগল মানুষ বিদেশি পাখি খাঁচায় রেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন। পৃথিবীর নানা দেশে পক্ষিপ্রেমীরা খাঁচায় পাখির ডিম ফুটিয়ে, ছানা বড়ো করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দিয়ে আসে। এতে পাখির সংখ্যা বাড়ছে। ভারতেও এই প্রয়াস জনপ্রিয় করার ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন।

দীপকবাবু বলেন পাখি নিয়ে প্রায় ১০০টি বই বাংলাভাষায় পাওয়া যায়। কিন্তু তা সার্বিক প্রয়োজনের নিরিখে অপ্রতুল। বাংলাভাষায় ডঃ সত্যচরণ লাহা ও অজয় হোম —দুজনেই প্রচুর লিখেছেন। এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। পাখি-সংক্রান্ত সমস্ত বই এক জায়গায় সংরক্ষিত রাখার উপর তিনি জোর দেন, তাহলে পাখি প্রেমী পড়ুয়া ও গবেষকদের সুবিধা হবে। সত্যচরণ লাহা ও অজয় হোমের যাবতীয় রচনার সুস্পাদিত সংকলন প্রকাশের দাবিও জানান।

আলোচনার প্রারম্ভে প্রয়াত অজয় হোমের কন্যা সুতপা রায়চৌধুরি স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বাবার জীবনের নানা টুকরো তথ্য তুলে ধরেন। পাখি চর্চা ছাড়াও তাসের নেশা, ক্রিকেট খেলা ও শিশুসাহিত্যের ঘরানায় তাঁর বহু কাজ ছড়িয়ে আছে।

'বন্যপ্রাণ' পত্রিকার সম্পাদক হিরণ্ময় মাইতি বলেন, পাখিচর্চায় বাঙালির এতাবৎ যাতীয় প্রয়াসকে সুসংহত করে তথ্যপঞ্জি গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় প্রাণী সমীক্ষা পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ শান্তনু ঘোষ বিস্তারিতভাবে এই রাজ্যে পাখি গবেষণার নানা তথ্য ও সমস্যা তুলে ধরেন। বাস্তুতন্ত্র যেভাবে নষ্ট হচ্ছে, তাতে পাখি সংরক্ষণ ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। অধ্যাপক রণতোষ চক্রবর্তী বলেন, ছোটো ছোটো পর্যবেক্ষণকে একত্র করলে একটা বড়ো আকার নিতে পারবে। এজন পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে বিভিন্ন উৎসাহী বিজ্ঞান ক্লাব ও পরিবেশ সংগঠনগুলি স্থানীয়ভাবে তথ্য আহরণ করে এক জায়গায় জমা করুক।

এই আড্ডায় পাখি পোষা বিষয়ে অভিজ্ঞ বেশ কিছু উৎসাহী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ে অন্যতম বিশেষজ্ঞ সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পাখি সম্পর্কিত যাবতীয় জঢানভাণ্ডারের বেশিটাই আহরিত হয়েছে পাখি পালক তথা পাখির প্রজননকারীদের দ্বারা। এজন্য পাখি পোষা যেমন একটি প্রাচীন শখ তেমনি এর গুরুত্ব কম নয়। শিশুদের মধ্যে পাখির প্রতি ভালবাসা গড়ে তোলায় পাখির চিড়িয়াখানা তথা পোষা পাখির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী ডঃ সুহাস ভট্টাচার্য পাখি বিষয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। সিডি সহযোগে বক্তৃতা রাখেন কণাদ বৈদ্য, শান্তনু প্রসাদ। কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ অনুপম পাল বলেন, পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজে পাখিদের মূল্যবান ভূমিকাকে সুরক্ষিত রাখা দরকার। ডঃ সীমা মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর সুর, ডঃ নারায়ণ ঘোড়ই, ডঃ অনির্বাণ রায় (জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদ), ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু দাশ, নিরঞ্জন হালদার প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।

সঞ্চালক ছিলেন —দীপক কুমার দাঁ। বিকেল ৫টায় সভা শেষ হয়।

উ মা

বিজ্ঞান আছে, জ্ঞানই যা নেই!

ষড়ানন পন্ডা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত প্রত্যন্ত গ্রামের এক দরিদ্র গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের ঘেরাটোপে। রক্ষণশীল পরিবারে পৈতে হল। সংস্কৃত মন্ত্রগুলো মুখস্থ করে প্রতিদিন তিনবার আওড়াতে হত। পরে মন্ত্রগুলোর বাংলা তর্জমাগুলো জানতে পারলাম, প্রশ্ন হল মন্ত্রপড়ে জল যদি সত্যিই শুদ্ধ হয়, তাহলে টিউবওয়েলের জল কেন প্রয়োজন হবে? রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি বড় বড় ধর্মস্থানগুলোতে কেন টালা ট্যাঙ্ক, পলতা বা কোনও বড় জলাধারের পাইপ লাইন যুক্ত আছে? তাঁরা তো যে কোনো জলকে মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করে নিতে পারেন! সাধু মহারাজগণ থমকে গেলেন, এল না উত্তর। বুঝলাম, এঁরা সবাই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু বিশ্বাসটা থেকে গেছে অবিজ্ঞানে। তাই মন্ত্রপূত চরণামৃত এঁদের পানীয় নয়।

দেখলাম, সভ্য মানুষ, উন্নত মানুষদের প্রায় ৯৯ শতাংশ কুসংস্কারের মধ্যে জন্মাচ্ছেন, বড় হয়ে উঠছেন এবং কুসংস্কারের মধ্যেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছেন। মানে মানুষটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই কুসংস্কারের মধ্যেই খাবি খাচ্ছেন। আমি নিজেকে, আমার পরিবারকে আগে বিজ্ঞানমনস্কতার রসে ডোবাতে না পারি, তাহলে আমার স্বজনদের, সাথীদের কেমন করে বিজ্ঞানমনস্ক হতে বলব? বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, 'বিধবা বিবাহ আমি নিজে চালু করলাম, নিজের ছেলেকে যদি কুমারী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিই, তবে তো অমি ভণ্ড এবং কপট।'

এই দুরূহ পথে হাঁটতে গিয়ে শুরু থেকেই আমাকে সমাজের কাছে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি না করায় আমার খড়ের কুঁড়ে ঘরটিতে আগুন দিয়ে সপরিবার পুড়িয়ে মারার হুমকিও এসেছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই নি, সব সহ্য করে সমাজের সঙ্গেই আছি।

আমার এক সহপাঠী আমার চলার পথকে আরও দৃঢ় করে দিল। ওই বন্ধু আমার মায়ের স্মরণসভায় সভাপতির আসনে বসে বেশ বড় কথা বলে গেল—'আমি ১৯৫৬ সাল থেকে মার্কস্‌বাদী, ঈশ্বরটিশ্বর মানি না। শ্রাদ্ধশান্তি নিছক ভ্রান্তি।'

বছর দুই পরে তার মা মারা গেলেন। সে দিব্যি মাথা নেড়া করে ষোড়শোপচারে বৃষোৎসর্গ করে মায়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করল। বাদ গেল না ছানার ডালনা, মাটন, মিষ্টিও। এলাহি কাণ্ড। লাখখানেক টাকার বাজেট। 'মায়ের কাজ' বলে কথা!

কিছুদিন পরে সে আমার বাড়ি এল, সৌজন্য সাক্ষাৎকারে। নিজেই গড়গড় করে বলে গেল—'কী জান ভাই, মার্কস্‌বাদটা কেবল আমি বুঝি। আমার স্ত্রী, ছেলেপুলে, আত্মীয়বন্ধু তো কেউ মার্কস্‌বাদ বোঝে না, অথচ তাদের নিয়েই তো থাকতে হয়! মাছওয়ালা, মাংসবিক্রেতা, গোয়ালা— এরা যে সবাই আমাকে ভুল বুঝবে। তাছাড়া, কি জান ভাই, হাতেগোনা কয়েকজন ব্রাহ্মণ পৈতে ছেড়ে ছিলেন, একজনের স্ত্রীকে তো ভূতেও ভর করেছিল। রামমোহনের বড় ছেলে রাধাপ্রসাদ শাস্ত্রমতেই শ্রাদ্ধশান্তি করেছিলেন। ছোট রমাপ্রসাদ গয়াতে পিণ্ড দিতে গিয়েছিলেন ইত্যাদি।' বন্ধুর যুক্তিমালা শুনতে শুনতে ছোটবেলায় পড়া একটা গল্পের নীতিবাক্য মনে পড়ল— দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

এখনকার বিজ্ঞানের ছাত্রদের দু-একজন ছাড়া বাকিরা মোটা মাইনের চাকরিকে লক্ষ্য করে বিজ্ঞান পড়ছেন। তাঁদের হাতে দামি রত্ন, ঘরে ফেংশুই। ওঁরা জুয়েলারি দোকানের জ্যোতিষ সম্রাটের কাছে ভিড় জমান। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে অবসর জীবনে ঝামেলা মুক্ত হয়ে সস্ত্রীক আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নেন, একটু শান্তি পাওয়ার জন্যে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরতি ও শাস্ত্রপাঠের আসরে ছুটে যান। এঁরাই দুটো-চারটে বিজ্ঞানের কথা ভেজাল দিয়ে আশ্রমের মুখপত্রে প্রবন্ধও লেখেন। আবার 'বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত' (ডঃ মণি ভৌমিক), 'বিজ্ঞান -সনাতন ধর্ম-বিশ্ব সভ্যতা' (গোবর্ধন গোপাল দাস— ইস্কন) ইত্যাদি বইও প্রকাশ করেন।

এই দ্বিচারিতার পথ থেকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের সরে আসতে হবে এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণকে দায়বদ্ধতা হিসাবে দেখতে হবে। শুধু চাকরি লাভের জন্য নয়। আইনস্টাইনের সেই কথাটিকে 'দিনে শতবার আমি নিজেকে একথাই স্মরণ করাই যে, আমার গোটা জীবনটাই নির্ভর করে আছে অপরের শ্রমের উপর, তাদের কেউ জীবিত কেউ বা মৃত এবং তাদের কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি ও আজও পাচ্ছি, ঠিক সমানভাবেই তার প্রতিদান আমাকে অবশ্যই দিতে হবে কথাগুলো মস্তিষ্কে জাগ্রত রাখতে হবে।'

বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ম্যাপের ক্ষুদ্র দ্বীপের বিন্দুর আকারে প্রায় অদৃশ্য ফুটকির মতো। আমাদের দেশের সরকার বিজ্ঞান শিক্ষাকে ফ্যাশনের মতো ধরে রেখেছে। (১) পৃথিবীর কাছে প্রেসটিজ বাড়ানো এবং (২) যুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির নতুন নতুন সাজ-সরঞ্জাম বানানো। বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করে চুটিয়ে লাভ করার আশায় বিজ্ঞান শেখায়।

বিজ্ঞানের উৎপাদিত রেডিও, টিভি, মোবাইল, যানবাহন, ঔষধপত্র সমস্ত মানুষ ব্যবহার করলেও বিজ্ঞান মনস্কতার সঙ্গে

এ সবের কোনও সম্পর্ক নেই। নির্বাচন, ধর্মীয় উৎসব, সিনেমা, যাত্রা, গান ইত্যাদিতে মানুষ যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, বিজ্ঞানের প্রতি মানুষকে সেভাবে উদ্বুদ্ধ করার পরিকল্পনা নিতে হবে। গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান মেলা, প্রদর্শনী, বিজ্ঞান তথ্যের সিনেমা। ভিডিও, সঙ্গীত-আলেখ্য, বড় বড় বিজ্ঞানীদের জীবন আলেখ্য, বিবর্তনের ইতিহাস পর্দায় দেখানো, স্কুল, কলেজ ও ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে নিতে হবে।

বিজ্ঞানের বই, পত্র-পত্রিকা প্রত্যেক বাড়িতে রাখতে হবে। সপ্তাহে একদিন পরিবারের পাঠচক্র চালু করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান বইয়ের লাইব্রেরি চালু করতে হবে। কলকাতার ঘেরাটোপ থেকে বিড়লা তারামণ্ডল, সায়েন্স সিটি, বিড়লা মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ক্যালকাটা প্যানোরামা প্রভৃতির তথ্যাবলীকে ভিডিও ক্যাসেট বন্দী করে গ্রামের বিজ্ঞান মেলায় দেখাতে হবে।

হিন্দুর ঘরে পাঁজি, লক্ষ্মীর কুলুঙ্গি, হরিমঞ্চ যেভাবে রাজত্ব করছে, অন্য ধর্মীয়দের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও সেইভাবেই রাজত্ব করছে। বিজ্ঞানের তথ্যাবলীকে আপামর জনগণের মধ্যে হাজির করার প্ল্যানিং অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

আমার প্রস্তাবগুলো আপনারা ভাবুন, অন্যদের ভাবিয়ে তুলুন। এবং বাস্তবায়নের জন্য সংকল্প নিন।

উ মা

প্রসঙ্গ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

গত ২৪ নভেম্বর উৎস মানুষ আয়োজিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বাতী ভট্টাচার্য। সামগ্রিক বক্তব্য শুনে মনে হল, সম্ভবত উনি ভুলে গিয়েছিলেন উৎস মানুষের মঞ্চে বসে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে, উনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল নারীবাদী সাংবাদিকতার একটি অগোছালো অভিজ্ঞতা মাত্র! পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত মেয়েদের কতটুকু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে (ছেলেরা জায়গা করে দিতে পরেছে) তার একটা শতকরা হিসাব, পাশে রাখা স্ক্রিনে প্রতিফলিত তথ্য দেখে বলার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে মেয়েরা কতখানি সচেতন কতখানি ক্ষমতা অর্জন করে মর্যাদার সঙ্গে উঠে আসতে পেরেছেন, সে দিকটি এড়িয়ে গিয়েছেন। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলির মেয়েরা যে ভাল অবস্থায় নেই, বলাই বাহুল্য শ্রোতারা তা অবগত আছেন। কিন্তু কত ভাগ মেয়েরা সচেতনতার জোরে, বিজ্ঞানমনস্কতার জোরে মর্যাদার সঙ্গে উঠে আসতে পেরেছেন, সেটুকু জানতে পারলে আমরা শ্রোতারা বুঝতে পারতাম এখন মেয়েরা কতখানি ভাল আছেন। উনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে, যে নগণ্য সংখ্যক মেয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উঠে এসেছেন, তাঁরা পরিচালিত হচ্ছেন পার্টির দ্বারা, ছেলেদের দ্বারা। প্রমাণ হয়, মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের সচেতনতায় ক্ষমতায় উঠে আসতে পারে নি। আরো প্রমাণ হয়, স্বাতীর ক্ষোভ নারীবাদী মাত্র। তাই বলতেই হয় ভারতে মেয়েরা এখনো ভাল জায়গায় নেই। কারণ কেবল মাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের খতিয়ান দিয়ে মেয়েরা কেমন আছেন তা বলা যায় না। মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্কতার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ মাত্রেই জানেন, ঘরে ঘরে মা'র পাঠশালায় শিশুরা প্রথম পাঠ নিতে গিয়ে অলৌকিক বোধের শিকার হয়ে যায়, যা পরবর্তী প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে আর রক্ষা করা যায় না। প্রায় বেশিরভাগ নারীবাদী সংগঠনগুলির মতই উপর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, পাকিস্তানের কোন এক মহিলা সাংবাদিক কীভাবে মাস মাইনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বা স্কুল ছাত্রী মালালির কথা বলে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন! সর্বত্র বিজ্ঞান চেতনার কি ভীষণ মহামারী এবং সেক্ষেত্রে মেয়েদের না ভাল থাকার কথা একবিন্দুও বক্তব্যে উঠে আসে নি!

স্বাতীর বক্তব্যের একটি মাত্র সাংবাদিকতার কথা উল্লেখ করে চিঠি শেষ করব। উনি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গন ওয়াড়ির বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা যা আয় করেন সে তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত অঞ্চল কেরালার মেয়েরা তিনফসলি জমিতে অনেক বেশি পরিশ্রম করেন এবং প্রত্যেকে প্রায় দশ হাজার টাকা আয় করেন। এও বলেছেন সেই টাকা তারা সঞ্চয় করেন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ বর-পণ দিতে হবে! স্বাতীর কণ্ঠ এখানেও নারীবাদী মাত্র, এইটুকু ধরে বলা যায় শিক্ষিত অঞ্চলেও মেয়েরা ভাল নেই! অথচ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে স্বাতী একটিও কথা বলেন নি! কেরলে বামপন্থীরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বর-পণ বিরোধী আন্দোলন বহুবার করেছেন। এইসব আন্দোলন কেরলের শিক্ষিত মেয়েদের কতভাগ বর-পণ বিরোধিতায় উঠে আসতে পেরেছেন বা পারেন নি তা সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণে ছিল না। পারলে আমরা শ্রোতারা বুঝতে পারতাম তথাকথিত শিক্ষিত এলাকায় মেয়েরা কতটা ভাল আছেন কি নেই। সম্ভবত স্বাতীর বক্তব্য আপনাদের কাছে ক্যাসেটে বন্দি আছে, আমি অন্তত ঐ বক্তব্য থেকে একবিন্দু বুঝতে পারি নি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় মহাদেশে "এখন মেয়েরা কেমন আছেন"। সে জন্য বক্তা স্বাতী ভট্টাচার্যের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই, তবে উৎস মানুষ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের উপর কিছুটা থাকা স্বাভাবিক।

ফণিভূষণ জানা
সাঁতরাগাছি, হাওড়া

প্রয়াত সুবীরকুমার সেন

উৎস মানুষের পাঠকদের হয়ত সুবীরকুমার সেনের কথা মনে আছে। বইপত্র সংরক্ষণ নিয়ে চমৎকার একটি লেখা তিনি এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। মানুষটির সারা জীবনই কেটেছে বই নিয়ে। তাই এ বিষয়ে তাঁর মতো জানতেন কজন! দিন কয়েক অসুস্থ হয়ে গত ২৩ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন অধ্যাপক সেন। গণিতে স্নাতকোত্তর পাঠ চুকিয়ে হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার। সেই মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান দপ্তরেই শিক্ষকতা শুরু করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি নানা সামাজিক কাজে এবং বিজ্ঞান-ভাবনার প্রসারেও তিনি ছিলেন নিরলস। কখনও গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে পরিবেশ-সুরক্ষা জীববৈচিত্র্য নথি তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন; কখনও অজয় হোমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন 'প্রকৃতি' পত্রিকা। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানবিচিত্রা' পত্রিকার সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে ৯ এপ্রিল জন্ম। ৬৫ বছর ৯ মাসের জীবনে অজস্র কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন। নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, বন্ধু ও ছাত্রবৎসল মানুষটির মৃত্যু তাই অনেকের কাছেই বিরাট ক্ষতি। উৎস মানুষও হারালো এক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে।

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি সংখ্যা বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনও ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন **UBI** কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch,
Kolkata - 7000073.
Utsa Manush,
SB Account No. 0083010748838।
IFSC No. UTBIOCOL108

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পুস্তক তালিকা

- যে গল্পের শেষ নেই ৫০.০০
  দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ ৪২.০০
  (৫ম প্রকাশ) সংকলন
- প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ ৩০.০০
  অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
- তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) ১৮.০০
  রণতোষ চক্রবর্তী
- বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু ৪০.০০
  হিমানীশ গোস্বামী
- এটা কী ওটা কেন ৫০.০০
  সংকলন
- আমরা জমি দেই নি, দেব না' ১০.০০
- আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান ৫০.০০
  সংকলন
- আরজ আলী মাতুব্বর ২০.০০
  ভবানীপ্রসাদ সাহু
- প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ৬০.০০
  দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)
- বিবেকানন্দ অন্য চোখে/
  সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক ১০০.০০
- শেকল ভাঙা সংস্কৃতি ৬০.০০
- প্রমিথিউসের পথে ৩৫.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)। বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।